দাম : বারো টাকা

পুলওয়ামার হামলা কি ভারতের পাকপ্রেমীদের উজ্জীবিত করতে?
—পৃঃ ২৬

স্বস্তিকা

বিরিয়ানির গন্ধে রাহুলের একাদশীভঙ্গ
—পৃঃ ২৩

৭২ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা।। ২ মার্চ, ২০২০।। ১৮ ফাল্গুন - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com



পুলওয়ামার শহিদদের ভুলে গিয়ে কার হয়ে কথা বলছেন রাহুল

BELLA VISTA

51 Limited Edition Flats

Flat Starts From ₹87 Lac Onwards





Birds Eye View



Roof Top Garden



Swimming Pool



Podium

WBHIRA Registration Number : HIRA/P/KOL/2019/000483

www.edengroup.in

Developed by: EDEN | JALAN

9830 116 116


FLATS
NEAR TOLLY METRO
PLUS More
NO GST
EDEN
TOLLY
SIGNATURE
PLUS
G+12 HIGH RISES
2/3 BHK
With Private Terraces
48.34 lakhs
Onwards
Sky Lounge | Swimming Pool | Gymnasium | AC Banquet Hall
83358 44466 | 98303 05003
HIRA/P/KOL/2018/0099 • http://hira.web.gov.in
EDEN
Honest Promises. Honest Performances.
www.edengroup.in

www.edengroup.in

EDEN RICHMOND PARK

READY TO MOVE

NO GST

EDEN
Honest Promises. Honest Performances.



24.50 L Onwards
• 2/3 BHK •

Near Narendrapur
(Atlas More, Kodalia)

NEW LAUNCH



EDEN RICHMOND ENCLAVE

14.47 L Onwards
• 1/2/3 BHK •

Landscape Garden | AC Community Hall | Swimming Pool | Gymnasium & Spa | Home Theater Room | Children's Play Room | Games Room

Eden Richmond Park: HIRA/P/SOU/2019/000603 • http://hira.web.gov.in
Eden Richmond Enclave: HIRA/P/SOU/2018/000240 • http://hira.web.gov.in

9073666771

www.edengroup.in

EDEN



HURRY!!
Limited Period Offer

7Lacs
Onwards

1 RK
1/2 BHK

Meghbalika

Only 1% GST

Between Rajpur & Baruipur, Khasmullick


Adda Zone


Swimming Pool


Landscape Garden

HIRA/P/SOU/2018/000209
https://hira.wb.gov.in/

AC Banquet Hall | AC Gymnasium | Outdoor Kid's Play Area
Toddlers Play Area | Guest Room | Senior Citizen Zone | Rock Climbing | Home Theater
Card Room | Art Walk with Bengal Art & Sculpture

98306 26262

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ১৮ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২ মার্চ - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৯

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকরা বাঙ্গালি না মুসলমান?
▯ ড. জয়ন্ত কুমার রায় ▯ ১১

তোষণের রাজনীতি বন্ধ করে সমন্বয়ের রাজনীতি করুন
▯ রাজু সরখেল ▯ ১৪

এই বাজেট বিস্তারিত বিশ্লেষণের হকদার
▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ১৫

অযোধ্যার মন্দির হোক কৌশলা-সুখবন্ধন রামলল্লার
▯ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২১

বিরিয়ানির গন্ধে রাহুলের একাদশীভঙ্গ
▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ২৩

পুলওয়ামার হামলা কি ভারতের পাকপ্রেমীদের উজ্জীবিত করতে? ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ২৬

দেশভাগ বিরোধী কাপালিক ঋত্বিক
▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২৯

চিরসখা হে ▯ সারদা সরকার ▯ ৩১

মহাবীর লচিত বরফুকন ▯ জহরলাল পাল ▯ ৩৩

শিব ও শিবরাত্রি ▯ স্বপন কুমার দাশগুপ্ত ▯ ৩৪

গল্প : গোলাপি আলোর বন্যায় ▯ কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৫

খোলা চিঠি : দিদির তোষণ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৪৩

পাশ্চাত্যের দেশগুলির শরণার্থী নীতি নিজেদের ইচ্ছাধীন, তাহলে ভারতের ক্ষেত্রে নাক গলানো কেন?
▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ৪৪

বাংলাভাষার সঙ্গে বিশ্বের পরিচয়ের প্রথম রূপকার রবীন্দ্রনাথ
▯ ডা. বলরাম পাল ▯ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯
নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ **চিত্রকথা : ৪২**
▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৪৭-৪৯**

প্রকাশিত হবে
৯ মার্চ
২০২০

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৯ মার্চ
২০২০

লাগল যে দোল....

শীত বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি আবার একটু একটু করে রঙে রঙে সেজে উঠছে। এই সন্ধিক্ষণটি ভারতবাসীর বড়ো প্রিয়। বহু যুগ আগে থেকেই এ দেশের মানুষ প্রকৃতির এই রঙে ফেরার সময়টি ঘিরে উৎসব পালন করে আসছে। হোলি সেই উৎসব। পশ্চিমবঙ্গে আমরা যাকে দোল বলি। এই উৎসব রাঙিয়ে দেওয়ার উৎসব। রং মেলানোর উৎসব। পশ্চিমবঙ্গে দিনটির মাহাত্ম্য আরও একটু গভীর। এই দিনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেছেন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যাটি বিশেষ দোল সাহিত্য সংখ্যা। প্রকাশিত হবে পাঁচটি নানারঙের গল্প এবং মহাপ্রভুকে নিয়ে একটি বিশেষ রচনা। লিখবেন শেখর সেনগুপ্ত, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুজিত রায়, পার্থসারথী গুহ, জিষ্ণু বসু, সন্দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার



স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আপনি কাহার পক্ষে রাহুল?

পাঠকগণের স্মরণে রহিয়াছে যে, এক বৎসর পূর্বে পুলওয়ামায় ভারতীয় জওয়ানদের উপর কাপুরুষোচিত হামলা সংঘটিত করিয়াছিল পাকিস্তানের মদতপুষ্ট একটি জঙ্গি সংগঠন। এই ঘটনার পর পাকিস্তানকে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় বায়ু সেনা নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করিয়া পাকিস্তানের বালাকোটে জঙ্গি ছাউনি ধ্বংস করিয়া দিয়া আসে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী, ভারতীয় বায়ু সেনার এই বিমান হানায় তিন শতাধিক জঙ্গি নিহত হইয়াছিল। পাকিস্তান এই ঘটনা প্রথমে স্বীকার না করিলেও পরে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। পুলওয়ামায় জঙ্গি হানার একটি যথাযোগ্য জবাব ভারতের পক্ষ হইতে দেওয়া হউক—ইহা প্রত্যেক ভারতবাসীর মনোবাঞ্ছা ছিল। ভারতবাসীর সেই মনোবাঞ্ছা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার অপূর্ণ রাখে নাই। বালাকোটে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করিয়া ভারতবাসীর সেই দাবি সরকার পূর্ণ করিয়াছিল। বালকোটে বায়ু সেনার এই বীরত্ব প্রতিটি ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। প্রত্যেকেই বায়ুসেনার ভূমিকার অকুণ্ঠ সমর্থন এবং প্রশংসা করিয়াছিল। ব্যাতিক্রম ছিলেন নেহরু-গান্ধী পরিবারের সন্তান রাহুল গান্ধী। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মতোই রাহুল গান্ধীও প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, বালকোটে বায়ু সেনার বিমান হানার সচিত্র প্রমাণ কোথায়? দেশের সেনাবাহিনী নিজেদের জীবন তুচ্ছ করিয়া দেশ এবং দেশের মানুষকে রক্ষা করে। তাহাদের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া রাহুল গান্ধী সেইদিন সেনাবাহিনীকেই অপমান করিয়াছিলেন। তাহার আগে বা পরে অদ্যাবধি আর কেহই সেনাবাহিনীকে এই ভাবে অপমান করে নাই। রাহুল গান্ধীর এহেন কথাবার্তা পাকিস্তানকেই উৎসাহিত করিয়াছিল। রাহুল গান্ধী যখন পরোক্ষে পাকিস্তানের বক্তব্যকে সমর্থন করিয়াই এই ধরনের বক্তব্য রাখিয়াছিলেন, তখন তিনি শুধুমাত্র কংগ্রেসের একজন সাধারণ সংসদ সদস্য মাত্র ছিলেন না। তিনি সেই সময় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি, তদুপরি, প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিবার দিবাস্বপ্নে বিভোর। শতবর্ষের প্রাচীন একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান হইয়াও পাকিস্তানের সুরে সুর মিলাইতে তাহার সেইদিন বাধে নাই। রাহুল গান্ধীর এই ধরনের আচরণকে নিতান্তই রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতা বলিয়া খাটো করিলে চলিবে না। কেননা, দেশের প্রতি অবজ্ঞা এবং অপমানসূচক মন্তব্য ও ভঙ্গিমা রাহুল গান্ধী বিভিন্ন সময় করিয়াছেন। যদি এই সবকিছুকেই তাহার রাজনৈতিক অপরিপক্কতা হিসাবে ধরিতে হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে, এত অপরিপক্ক রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন এক ব্যক্তির রাজনীতিতে প্রবেশ করাই উচিত হয় নাই। নেহরু-গান্ধী পরিবারের এই পুত্রটি দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাহার আচরণে বা কথাবার্তায় তাহা কখনো প্রকাশ পায় নাই। ইতিপূর্বে ইউরোপ, আমেরিকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোনো কোনো দেশে ভ্রমণকালে বিভিন্ন সভায় তিনি দেশ এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে আপত্তিকর এবং অবমাননাকর মন্তব্য করিয়াছেন। এক মুহূর্তের জন্যও ভাবেন নাই, তাহার এইসব মন্তব্য বিদেশে ভারতের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করিয়াছে। দেশের শত্রুদেরই উৎসাহিত করিয়াছে। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা পাক জঙ্গির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছে, কাশ্মীরে জঙ্গিদের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য যাহারা ৩৭০ ধারা রদের বিরোধিতা করিয়াছে—ইহাদের প্রত্যেকের পার্শ্বেই রাহুল গান্ধীকে উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু কেহই এই কথা কখনো বলিতে পারিবে না যে, রাহুল গান্ধী এমন কোনো মন্তব্য বা আচরণ করিয়াছেন, যাহাতে দেশের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে।

রাহুল গান্ধীর বারংবার একই ধরনের আচরণ দুইটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। প্রথমত—রাজনীতিতে তিনি সত্যকারের অপরিপক্ক। এমন অপরিপক্ক ব্যক্তির কোনো রাজনৈতিক দলে নেতৃত্ব দিবার অধিকার নাই। দ্বিতীয়ত, সচেতনভাবেই যদি এইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, তবে প্রশ্ন এই যে, কাহার স্বার্থে তিনি এইরূপ কাজ করিতেছেন? তাহার এই আচরণে লাভবান হইতেছে কে?

সুভাষিতম্

দর্শনে স্পর্শণে বাপি শ্রবণে ভাষণোঽপি বা।

যত্র দ্রবত্যন্তরঙ্গং স্নেহ ইতি কথ্যতে।।

যদি কাউকে দেখা অথবা স্পর্শ করা, শোনা অথবা কথা বলা মাত্রই হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে যায়, তবে তাকে স্নেহ বলা যেতে পারে।

রম্যরচনা

মাতালের আবিষ্কার

এক পাঁড় মাতাল এক বিজ্ঞানীকে ফোন করে বলল, আমি দশ বছর গভীর সাধনা করে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছি যেটা দেওয়ালের মধ্যে বসিয়ে দিলে এপার-ওপার পরিষ্কার দেখা যাবে।

বিজ্ঞানী বললেন, আপনাকে অভিনন্দন। কী সেই যন্ত্র?

মাতাল গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, সেটি জানালা।

* * *

মোবাইল ম্যানিয়া

স্বামী : কতবার তোমাকে বলেছি রান্না করতে করতে মোবাইল দেখবে না। এটা ডাল হয়েছে? না নুন, না কোনো মশলা।

স্ত্রী : তোমাকেও কতবার বলেছি খেতে খেতে মোবাইল দেখবে না। ভাতে ডাল না মেখে তুমি জল ঢেলে নিয়েছ, আর বলছ নুন নেই, মশলা নেই।

* * *

পাগলের আয়না দেখা

এক পাগল আয়নার সামনে বসে নিজেকে দেখছে আর ভাবছে, একে কোথায় যেন আগে দেখেছি। ভাবতে ভাবতে বলে উঠল— হ্যাঁ, গতকাল এক সঙ্গে বসেই তো সেলুনে চুল কাটালাম।



উবাচ



"খতম করব ইসলামি সন্ত্রাসবাদ। যে দেশ ইসলামি সন্ত্রাসবাদে মদত দেবে, তাদেরই কঠোর শাস্তি পেতে হবে। আমার প্রশাসন সন্ত্রাস রুখতে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করছে। আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।"

ডোনাল্ড ট্রাম্প
আমেরিকার রাষ্ট্রপতি

ভারত সফরে আমেদাবাদে সংবর্ধনা সভায় বক্তব্যে



"নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধী দুবার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন। রাজীব গান্ধীও সরকার গড়েছিলেন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। কিন্তু তাঁরা কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের সাহস দেখাতে পারেননি। মে মাসে দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ফিরে মোদীজী সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। যার ফলে কাশ্মীর ও লাদাখের মানুষ আনন্দে রয়েছেন।"

জেপি নাড্ডা
বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি

সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে



"যে বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে, তাতে ভর করেই আগামীদিনে একজোট হয়ে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিকা করতে হবে।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

আমেদাবাদের মোতেরা স্টেডিয়ামে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংবর্ধনা সভায়



"বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তিনি আন্তর্জাতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। ১৫০০টির মতো অচল আইনকে বাতিল করায় প্রধানমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী ধন্যবাদের যোগ্য।"

অরুণ মিশ্র
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি

নয়াদিল্লিতে আন্তর্জাতিক বিচার বিভাগীয় সম্মেলনে

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকরা বাঙ্গালি না মুসলমান?

ড. জয়ন্তকুমার রায়

শিরোনামে উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান একাধিক কারণে অতীব প্রয়োজনীয়। দুই বঙ্গের বাঙ্গালিদের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা ও সীমাবদ্ধতা এই উত্তরে নিহিত। এর অনুসঙ্গ হিসেবে দুই বঙ্গের মুসলমানদের প্রভাব বিকীরণের বিষয়টিও এই উত্তরের সঙ্গে জড়িত।

প্রসঙ্গত, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্তে পাকিস্তানের সৃষ্টি আলোচনার শীর্ষে চলে আসবে। প্রাক ১৯৪৭ ভারতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য ও সমর্থন ব্যতীত পাকিস্তান সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। কিন্তু করাচী-রাওয়ালপিণ্ডি-ইসলামাবাদ ভিত্তিক পাকিস্তানি শাসককুল পূর্ববঙ্গের (১৯৫৬ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের) গণতান্ত্রিক আশাআকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতিদানে অনিচ্ছুক ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে ঘোষণা করা হয় যে উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা। এটা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, যেহেতু পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ মানুষ ছিল বাংলাভাষী। কিন্তু এর প্রতিবাদে আমরা কতটা বাঙ্গালিত্বের প্রতাপ দেখেছিলাম? তেমন কিছু নয়। অল্পসংখ্যক ছাত্র এবং প্রাদেশিক সচিবালয়ের তৃতীয়-চতুর্থ বর্গের কর্মীরা ওই ঘোষণার প্রতিবাদ করে। কিন্তু খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন চুপচাপ সরকারি আনুকূল্যের প্রত্যাশায়।

এই ঘটনাটি আদৌ প্রচার পায়নি কিন্তু পরবর্তী একটি ঘটনা ব্যাপক প্রচার লাভ করে। ১১ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উপলক্ষ্যে মুহাম্মদ আলি জিন্নার ঘোষণা ঃ 'উর্দু, কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা'। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাত্রা ছিল কতখানি? আবারও তেমন কিছু নয়। নাইমুদ্দিন আহমেদ নামে একজন মাত্র ছাত্রের নেতৃত্বে তার কতিপয় সতীর্থ জিন্নার ঘোষণার বিরুদ্ধে চিৎকার করে বলে ঃ 'না, না'। কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হচ্ছিল। হলের বাইরে যাওয়ামাত্র নইমুদ্দিনকে গ্রেফতার করে পুলিশি হাজতে রেখে তার ওপর অত্যাচার করা হয়। নইমুদ্দিনের সমর্থক কিছু ছাত্রকেও নানারকম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কাউকে কাউকে দীর্ঘ ও কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। কেউ কেউ পলাতক হয়ে গ্রেফতারি পরোয়ানা এড়িয়ে যায়। ভাষা আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত এই কতিপয় ছাত্র কোনওদিন তাদের প্রাপ্য সম্মান পায়নি; তাদের ক্রন্দন অশ্রুত; তাদের গল্প অকথিত। অতএব প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ছিল ভাষা না ধর্ম। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তারিখে কতিপয় ভাষা আন্দোলনকারীর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর ইতিপূর্বে ভাষা আন্দোলন উপস্থাপনের বার্ষিক তিথি ১১ মার্চের স্থলাভিত্তিক হয় ২১ ফেব্রুয়ারি।

ভাষা আন্দোলনের কয়েক বছর পূর্বে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পর বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা কি বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের অনুকূলে ছিল? মোটেও না। দেখা গেল, পূর্ববঙ্গে জিন্নার গুণমুগ্ধ মুসলমানদের সংখ্যা অগণিত। জিন্নার প্রশংসায় প্রবন্ধ, নাটক ও কবিতা প্রকাশিত হচ্ছিল। উপরন্তু সদ্য-প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের ভাবনা ও আদর্শের আলোচনায় কোনোও দোষ ছিল না, এবং ইসলামের ওপর গুরুত্ব দেওয়া ছিল স্বাভাবিক। কারণ পাকিস্তান ছিল সংখ্যাধিক্য মুসলমানের দেশ। কিন্তু সাধারণ মানুষের সামূহিক হিতসাধনে শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদিতে আধুনিক ধ্যানধারণার আলোচনায় তদানীন্তন মুসলমান বিজ্ঞানী, কবি, লেখকরা যে অনাগ্রহী ছিলেন সেটাও অনস্বীকার্য। এভাবে তারা ছিলেন নিজেরা পথভ্রষ্ট এবং সাধারণ মুসলমানকেও পথনির্দেশে ব্যর্থ। ইসলাম ও জিন্নার জয়গানই যেন মুখ্য।

অথচ, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের



বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই বুদ্ধিজীবীরাই যেন ছিন্ন বসন পরিত্যাগ করে নতুন বেশ গ্রহণে উদ্যোগী হলেন। এই উদ্যোগ কতটা আন্তরিক ছিল? বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ছিল মাত্র নয় মাসের। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে ১৯৪৭- পরবর্তী পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামি লিগ পাকিস্তানের সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু ১৯৬৬ সালে প্রণীত যে ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে নির্বাচনী লড়াই পরিচালিত হয়, তার মূলে ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবি, যাতে শক্তিশালী পশ্চিমাঞ্চলের শাসকরা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে নানা ক্ষেত্রে শোষণের সুযোগ না পায়। স্বাধীনতার দাবি তো দূরে থাক, বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের ক্ষীণ ধ্বনিও ছিল অস্ফুট।

এদিকে, ১৯৬০-এর দশকেই সেনাপতি আইয়ুব খানের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, সেখানে নিতান্তই আত্মরক্ষার তাগিদে মৃতপ্রায় ভাষা আন্দোলনে একটু প্রাণসঞ্চারের প্রয়োজন হলো। যেহেতু মুসলমান হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সমকক্ষ হওয়া গেল না, অতএব বাংলাভাষা, রবীন্দ্র-নজরুল সংগীত ইত্যাদি দ্বারা আপন ঘরে ফিরে চলার

উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু এতেও শেষ রক্ষা হলো না। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা ছিল এতটাই উৎপীড়ন ও দমনমনস্ক যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ফলাফল ধ্বংসার্থে ২৫ মার্চ ১৯৭১ স্বদেশীয় পূর্ব পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে নির্মম সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ থেকে ২৫ মার্চ ১৯৭১ প্রায় সাড়ে তিন মাস সময় অসহযোগ আন্দোলন করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানিদের কোনো বিকল্প ছিল না। প্রায় ২৪ বছর পাকিস্তানের ইসলামি শাসনে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালিরা প্রায় পুরাপুরি (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) পাকিস্তানি ভাবধারার অনুসারী হয়। তারা দ্বিজাতিতত্ত্বের অনুগামী হয়ে নিজেদের বাঙ্গালি হিন্দুদের থেকে পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

অতএব ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের বিদায়ের শেষবাণীর মতো শেখ মুজিবুরের যে বিখ্যাত ভাষণ তাতে আবেগ ছিল, বাগ্মিতা ছিল, কিন্তু 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই শেষ পঙ্‌ক্তিটি ছিল অস্পষ্ট আর্তনাদের অস্বচ্ছ কলরোল। মার্চ ১৯৭১ থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা পরিচালনায় খুব একটা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়নি। জীবনযাত্রা প্রায় স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু দেশজ ও আন্তর্জাতিক নানা ঘটনাচক্রের টানাপোড়েনে ভারতকে শেষ পর্যন্ত সামরিক হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে নতুন একটি নতুন স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু তারপর? বাংলাদেশের মুসলমানদের বাঙ্গালিত্বে প্রত্যাবর্তন কি সুদৃঢ় ও সাবলীল হলো? একেবারেই না। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান ভারতের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত। এতে ছিল পরমধর্মসহিষ্ণুতা (যাকে প্রান্তভাবে সেকুলারিজম বলা হয়)। কিন্তু ১৯৭২ সালে ক্ষমতার অধিষ্ঠিত শেখ মুজিবুর রহমান (যাকে হাস্যকরভাবে বাংলাদেশের অধিবাসীরা অদ্ভুত ভোটদানের মারফত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি হিসেবে অভিহিত করেছে) নিজেও সেকুলার ছিলেন না। তিনি অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রণয়ন করে অভিনব কৌশলে হিন্দু বিতাড়নের স্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। ১৯৭২ এর সংবিধানের ৩৮ ধারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি রুদ্ধ করে। কিন্তু ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ শেখ মুজিবের হত্যার পর সেনাপতি জিয়াউর রহমান ৩৮ ধারা লুপ্ত করেন। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করলো। পাকিস্তান ও ইসলামের অনুসারী শক্তিগুলি যাতে তাকে ক্ষমতাচ্যুত না করতে পারে এজন্য জিয়া ১৯৭৬ সালে একটি নির্দেশিকা জারি করেন, যাতে দেশটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলির অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে যায়। জিয়ার উত্তরসূরি সেনাপতি এইচ এম এরশাদ ইসলামিকরণকে আরও সতেজ করেন; এমনকী রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীর মতো অনুষ্ঠানেও মিলাদ প্রবর্তন করেন। ১৯৮৩ সালে নতুন শিক্ষানীতিতে এরশাদ আরবি অবশ্যপাঠ্য করেন। ১৯৮৮ সালে এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের স্বীকৃতি দিলেন, কোনও আন্দোলন প্রতিবাদ হলো না। ১৯৪০ এর দশকে বাঙ্গালিত্ব মুছে যে ইসলামি পরিচিতি প্রাধান্য পেয়েছিল, ১৯৮০-র দশকের পর তাঁর পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সঙ্গে সংগতি রেখে মাদ্রাসা শিক্ষার বিপুল প্রসার হলো। ইসলামিকরণের পরিবর্ধনে এরশাদের পর খালেদা জিয়ার সরকারও তৎপর ছিল। জামাত-এ-ইসলামির সমর্থনেই তিনি ক্ষমতায় আসেন এবং ক্ষমতার স্থায়িত্বের জন্য তিনি জামাতের মনমতো কাজই করতে থাকেন। যেমন তসলিমা নাসরিনের লজ্জা উপন্যাসের বিরুদ্ধে তার প্রতিক্রিয়া ছিল মাত্রাতিরিক্ত প্রতিকূল। কারণ এ নয় যে ওই উপন্যাসে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের বর্ণনা ছিল। কারণ সেটাতো আদৌ অজানা কিছু নয়। কিন্তু ওই ঔপন্যাসের জাতীয় আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তার ফলে সমস্যাটি যেন অনেকের মনশ্চক্ষু উন্মীলিত করে। অতীতে অবস্থা ছিল অত্যাচারের প্রচারের অভাব যেন অত্যাচারেই অনুপস্থিতি। খালেদার হিন্দু-বিরোধী নীতি মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের তুষ্ট করে। কিন্তু জামাত খুশি ছিল না, কারণ জামাত শরিয়ত আইনের প্রবর্তন চায়, যেটা খালেদার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর জামাতও আওয়ামি লিগের সঙ্গে হাত মেলাতে বিলম্ব করেনি। রাজনৈতিক বিবর্তন জটিল হয়ে গেল। সব কিছু বর্ণনার অবসর এখানে নেই। অতএব ঘটনাপ্রবাহকে একটু ছোটো করে এনে বর্তমান আওয়ামি লিগ সরকারের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা যাক। সামরিক শাসনকালে ১৯৭২ এর সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে মুখবন্ধে 'বিসমিল্লাহির্রহমানির্রহিম' সন্নিবিষ্ট করে সেকুলারিজম ইত্যাদিকে লুপ্ত করা হয়। অষ্টম সংশোধনী দ্বারা ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হয়। সুখের বিষয়, সামরিক আমলের এই দুই সংশোধনীই দেশের সর্বোচ্চ আদালত ২০১০ সালে প্রত্যাখান করে। এতদ্‌সত্ত্বেও, ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনী মারফত শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগ সরকার সংবিধানের মুখবন্ধে 'বিসমিল্লাহির্রহমানির্রহিম'কে পুনরুজ্জীবিত করে এবং ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম এটাও সংবিধানে প্রত্যাবর্তন করে। আওয়ামি লিগ নিজেকে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দল হিসেবে দাবি করে। এর নেত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু বহুবার হজ যাত্রা করেছেন, হিজাব পরিধানেও তিনি অভ্যস্ত।

জামাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা স্থাপনে আওয়ামি লিগ আদৌ ব্যগ্র নয়, যদিও ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে কিছু শীর্ষস্থানীয় নেতার ফাঁসির বন্দোবস্ত শেখ হাসিনা করেছেন। অথচ, জামাতের সংবিধান অনুযায়ী এই সংস্থা বাংলাদেশকে ইসলামি দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। রাজধানী ঢাকা এবং নানা জেলায়ও ইসলামি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ক্রমাগত প্রসার লাভ করছে। অরগানাইজেশন অব ইসলামিক কানট্রিজ (ওআইসি) ঢাকাকে ইসলামি কৃষ্টির কেন্দ্র বলে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশে প্রায় ১৪ লক্ষ কওমি মাদ্রাসা বিদ্যমান। এরা পুরোদস্তুর ইসলামি দেশ স্থাপনে ব্যস্ত। এই মাদ্রাসাগুলির পাঠ্যসূচি পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলির সমতুল্য।

পাকিস্তানে আয়ুব সরকার ব্যুরো অব ন্যাশানাল রি-কনট্রাকশন (বিএনআর) মারফত হিন্দুগন্ধী নাম ইত্যাদি বর্জন করে ইসলামি সংস্কৃতির প্রচারকল্পে কৃষ্ণচূড়া ফুলের নাম ফাতেমাজা রাখে (শুধু একটি উদাহরণই যথেষ্ট)। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ধ্বজাধারী হাসিনা সরকারের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বা এন



ঢাকায় ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান।

সি টি বি পাকিস্তানের বি এন আর-এর প্রতিরূপ। তাই জামাতের অন্যতম প্রতিভূ হেফাজত-এ-ইসলামের নির্দেশে পাঠ্যপুস্তক রচিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৭ সালে ছাত্র-ছাত্রীদের দেয়া পাঠ্যপুস্তকে মৌলবাদী নানা পরিকল্পনা অনুপ্রবিষ্ট সম্প্রদায়, জাতি ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য প্রচারিত হচ্ছে। সরকার জঙ্গিবাদের প্রতি শূন্য সহনশীলতার প্রচার করলেও পাঠ্যপুস্তকে সুকৌশলে অনতিসুপ্ত জঙ্গিবাদ কায়েম হচ্ছে। ২০১৯ সালে ঢাকার জাতীয় শিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পঞ্চম শ্রেণীর পুস্তকে অমুসলমানদের মিথ্যাচারী, সম্পত্তি বেদখলকারী, ভ্রষ্টাচারী ও পশুর চাইতেও অধম বলে বর্ণনা করেছে।

পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রায় অবিশ্বাস্য। হেফাজতের লিখিত নির্দেশে সংযোজন-বিয়োজন করে ২৯টি প্রস্তাব সরকার বিশ্বস্তভাবে পালন করেছে। এভাবে নাকি হিন্দু তাত্ত্বিকতা ও নাস্তিক্যবাদের কবল থেকে মুসলমান বিদ্যার্থীদের রক্ষা করা যাবে। বর্জিত লেখকদের সবাই হিন্দু নয়। অসাম্প্রদায়িক মুসলমান লেখকও আছেন। অতএব এস ওয়াজেদ আলির 'রাঁচী ভ্রমণ', কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঙ্গালির কথা', সুকুমার রায়ের 'আনন্দ', লালনের 'সময় গেলে সাধন হবে না' বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলাদেশের হৃদয়' বর্জ্য পদার্থ। এই লেখাগুলি পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, সাহিত্যরস, যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতা বিকীরণ করে। সুতরাং হেফাজতের মাপকাঠিতে বর্জনীয়।

এসব কার্যকলাপের সাফল্যের জন্য যে ধর্মীয় সংস্কৃতিক পরিকাঠামো প্রয়োজন সেটা প্রবর্তন ও পরিকল্পনায় বাংলাদেশ সৌদি আরব থেকে বিপুল আর্থিক সাহায্য পেয়েছে। ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা রূপায়ণে সৌদি আরবের আর্থিক সহায়তা জরুরি। কারণ প্রতি জেলায় ও উপজেলায় ৫৬০টি আদর্শ মসজিদ স্থাপন ও বহুমুখী ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গঠন অতীব ব্যয়সাধ্য। প্রতিটি সংস্কৃতিক কেন্দ্রে ইসলামি পাঠাগার থাকবে, ইসলামি অনুশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও মওলানাদের বহুবিধ নির্দেশনামা পঠনপাঠন কেন্দ্র ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে, অথবা শীঘ্র গঠিত হবে।

এই যে বাংলাদেশের মুসলমানদের বাঙ্গালিত্বের অধোগামিতা ও মুসলমানত্বের ঊর্ধ্বগামিতা, তার প্রভাব কি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের ওপর দৃশ্যমান? কারও কারও মতে, এই মুহূর্তে দিল্লি-বিরোধী যে আন্দোলনে হিন্দুদের নেতৃত্বেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল, সেখানে বাংলাদেশের মুসলমানদের মানসিকতা কি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর নিরপেক্ষ মূল্যায়নের প্রতীক্ষায়।

ইতিমধ্যে অত্যল্প যে ক'জন বাংলাদেশি মুসলমান বুদ্ধিজীবী মুসলমানত্বের বলয়ের বাইরে বাঙ্গালিত্বের নিভু নিভু প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে সচেষ্ট, তাদের প্রতি সম্ভ্রম জানিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার টানা যেতে পারে।

(লেখক ন্যাশনাল রিসার্চ প্রফেসর, মিনিস্ট্রি অব হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এবং সাম্মানিক অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

তোষণের রাজনীতি বন্ধ করে সমন্বয়ের রাজনীতি করুন

রাজু সরখেল

জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় কংগ্রেস, ইন্দিরা কংগ্রেস, সোনিয়া কংগ্রেস, রাহুল কংগ্রেস সব মিলিয়ে কংগ্রেসের কঙ্কালসার চেহারা দিল্লির বিধানসভা নির্বচনের পর আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। সর্বভারতীয় কংগ্রেস এখন আঞ্চলিক দলে পরিণত। 'বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া' অর্থাৎ বিজেপির সঙ্গে টেক্কা দিতে গিয়ে অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি যে দলের স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মতো স্বনামধন্য ব্যক্তি, পাশাপাশি যে দলের চালক আদবানীজী, অটলজী, সুষমাজী, অরুণ জেটলি, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, মনোহর পার্রিকর, অনন্ত কুমার, মোদীজী, অমিতজীর মতো দেশভক্তরা, এছাড়া দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন বা ছিলেন, দলের অগণিত কার্যকর্তা যাদের নিরলস পরিশ্রম এবং আর এস এস-এর মতো দেশপ্রেমী সংগঠনের অনুপ্রেরণা দলের মধ্যে বিরাজমান, সেই দলকে টেক্কা দিতে কুড়িটি দল একত্রিত হয়েও কিছু করতে না পারার লজ্জা এদের কুরে কুরে খাচ্ছে। এদিকে আপের সবকিছু ফ্রিতে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে কংগ্রেস ও সিপিএমের জামানত বাজেয়াপ্ত হলো। একটু ভাবুন, আপের ক্ষমতা দখলের পিছনে রয়েছে কেজরির কলঙ্কিত রাজনীতি। আগামীদিনে দিল্লিবাসী বুঝবে 'কত ধানে কত চাল'? পাঁচ বছরের জন্য পুনরায় দিল্লিবাসীকে সেবার নামে প্রথমেই ইমামভাতা ও মোয়াজ্জেম ভাতা বাড়িয়ে দিয়ে শুরু হলো কেজরির তোষণের রাজনীতি। ভাবছি, দিল্লিতে হিন্দুদের অস্তিত্ব আগামীতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? কারণ, কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ভোটাররা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপকে ভোট দেয়েছে। মনে রাখা ভালো, কেজরি দলের প্রতীক হলো ঝাঁটা আর তা দিয়ে হিন্দু সাফাই হবে এটা নিশ্চিত। কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করেছে এবং সারাদেশের মানুষ বাহবা দিলেন যা কংগ্রেসের সত্তুরের রাজনীতিতে করা সম্ভব হয়নি। আজ কেজরির দয়ায় দিল্লিতে পুনরায় সেই ৩৭০ ধারা চালু হলো বলে মনে হয়। 'ফ্রি'তে দরিদ্র ও সাধারণ মানুষেরা সুবিধে পেতে থাকলে হতকুঁড়ে হয়ে যাবে। তাদের কর্মক্ষমতা লোপ পাবে। আগামীতে চাকরি, ঘর-বাড়ি, পাত্র-পাত্রী, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি চাইবে একটি ভোটের বিনিময়ে। এক সময় রাজ্য দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখাবে। মোদীজী দেশকে ঋণমুক্ত করার চেষ্টা করছেন, দেশকে স্বনির্ভর করার চেষ্টা করছেন, আর কিছু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র সংখ্যালঘুদের সুবিধে দিচ্ছেন। জনগণের করের টাকায় সবকিছু ফ্রিতে দেওয়ার রাজনীতি করে বিধানসভায় জয়ী হবার টার্গেট রাখছেন। কেজরি এবারের নির্বাচনে সেই নজির গড়লেন আর কেজরির পরোক্ষ মদতেই কিন্তু শাহিনবাগের ঘটনা ঘটল, যা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করল দিল্লিবাসী।

প্রসঙ্গত, এনডিএ বা বিজেপি দল দেশকে যেমন সঠিক দিশা দেখাতে পারে তেমনি সঠিক নিরাপত্তা দিতে পারে। সেই দলের ক্ষতি করার জন্য কংগ্রেস, সিপিএম, সপা, বসপা, আপ ও তৃণমূল উঠে পড়ে লেগেছে। এই আঞ্চলিক দলগুলি আরএসএস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নিন্দা ও সমালোচনা করতে পারে কিন্তু জামাত ও মিমের মতো দেশবিরোধী সংগঠনগুলির সমালোচনা করতে বুক কাঁপে এদের, ভয় পায় অবিজেপি দলগুলি। এটা ভাবার বিষয়। আসাদুদ্দিন ওয়েসির সিএএ বিরোধী সভায় কলেজ ছাত্রীমুখে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান বুঝিয়ে দিল মিম দলটি যেন তেন প্রকারেণ ভারতকে টুকরো করতে চাইছে। এবার দেখতে হবে, কংগ্রেস, সিপিএম, সপ, বসপা, তৃণমূল দলগুলির নেতারা কতটা সোচ্চার ওই দেশদ্রোহী বক্তব্যের বিরুদ্ধে? দেখব, ডান-বামের মদত পুষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও কলাকুশলীরা রাস্তায় নামেন কিনা। আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ও দৈনিক সংবাদপত্রে নজরে এলো যে হলদিবাড়ি হুজু সাহেবের মেলায় গিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী আর চ্যাড়াবান্দা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান একটা পুস্তিকা উদ্‌বোধন করে তোষণের রাজনীতি করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর হুবহু নকল করে চলেছে টিএমসি দলের নেতা ও মন্ত্রীরা। তবে মুখ্যমন্ত্রী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দজী মহারাজের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে গিয়ে অনুশোচনার সুরে বললেন, তিনি মুসলমান তোষণ করেন না, তিনি মানবতাকে তোষণ করেন। এতদিন তিনি বলে আসছিলেন যে 'আমি মুসলমান তোষণ করি'। পিকের শেখানো বুলি আওড়াচ্ছেন বলে মনে হলো! বিষয়টি কিছুই না বিষয়টি হলো আগামী পুরসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে হিন্দু ভোটের রাজনীতি করলেন।

অবিজেপি দলগুলির কাছে আবেদন তোষণের রাজনীতি বন্ধ করে সমন্বয়ের রাজনীতি করুন আর গঠনমূলক চিন্তা করুন। কারণ, বিরোধীদেরও কিন্তু বড়ো ভূমিকা রয়েছে দেশ ও দশের জন্য। ▮

শোক সংবাদ

হাওড়া জেলার ডোমজুড় খণ্ডের সঙ্ঘের সম্পর্ক প্রমুখ ডাঃ দীপেন্দ্রনাথ বাগের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাশীনাথ বাগ গত ৫ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। এলাকায় স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার প্রসারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন প্রচারক বিপুল গুহঠাকুরতা গত ২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। বর্তমানে তাঁর ১ ভাই ও দুই বোন রয়েছে।

এই বাজেট বিস্তারিত বিশ্লেষণের হকদার

শেখর সেনগুপ্ত

১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সদস্যসংখ্যায় টইটম্বুর সংসদে দীর্ঘ ২ ঘণ্টা ৪১ মিনিট ধরে ২০২০-২১ আর্থিক বছরের বাজেট প্রস্তাব পেশ করলেন। সংসদীয় ইতিহাসে এটা একটা রেকর্ড। উচ্চারিত প্রতিটি প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ। আমিও কাগজ-কলম নিয়ে বসে ছিলাম টিভির সামনে। কেউ আমাকে উঠে পড়বার জন্য তাড়াও দেয়নি। ভাষণে সীতারামনের সৌজন্যমূলক মন্তব্যগুলিও ছিল আকর্ষক। তবে একটানা পাঠ করতে করতে একসময় তিনি অসুস্থ বোধ করেন। বিরতি নেন। সংবাদসূত্রের খবর, ধারাবাহিকভাবে এই জটিল বিবৃতি ব্যাখ্যা সহকারে প্রদানকালে তাঁর রক্তচাপ অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। পরে অবশ্য সুস্থ হয়ে ওঠেন। আর আমরা সাক্ষী হয়ে থাকলাম এমন এক আর্থিক প্রস্তাব পেশের— যার গুরুত্ব এই দেশের ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, আহারে পুষ্ট এবং অনাহারে অপুষ্ট সকলের নিকটই অপরিসীম। কোনো বাজেটই অবশ্য সকলের হৃদয় জয় করবার মতো দিশাদায়ক হয়ে উঠতে পারে না। তবে অধিকাংশ নাগরিকের সঙ্গে এই বাজেট প্রস্তাব কম-বেশি অ্যাটাচমেন্ট তৈরি করতে পেরেছে। অনেকে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত, আবার রাজনীতির গেরোয় আবদ্ধ থেকে তেড়ে গালিগলাজ করলেন, এ রকম লোকেরও দেখা মেলে বই কী। তবে নির্ভেজাল বিশ্লেষণে বসে অন্যদের মতামতকে শেয়ার করতে রাজি, এ জাতীয় লোকের দেখা মেলা ভার। গৌরচন্দ্রিকায় ইতি টানবার প্রাক্কালে যে সত্যিটা অনস্বীকার্য মনে হচ্ছে, তা হলো এই যে, আমাদের দেশটা কিন্তু জনসংখ্যার বিচারে অতিকায়। বিভিন্ন পথ, দর্শন এবং সবার অলক্ষ্যে ব্যক্তিবিশেষের হিসেব-নিকেশ সমানে কাটাকুটির খেলা খেলেই চলেছে। এরই মধ্যে যাঁরা যথার্থ প্রতিধানযোগ্য, এখানে তাঁদেরই একের পর এক তুলে ধরবার চেষ্টা করছি আতস কাচের নীচে। প্রথমেই ধরে নিচ্ছি সরকারের আয় হলো ১ টাকা অর্থাৎ ১০০ পয়সা। এই ১০০ পয়সা সরকারের কোষাগারে ঢুকছে নিম্নোক্ত উৎসগুলি থেকে :

উৎস		পরিমাণ
ঋণ	—	২০ পয়সা।
জিএসটি, সমেত তাবৎ বাণিজ্য কর	—	১৮ পয়সা।
কর্পোরেশন কর	—	১৮ পয়সা।
আয়কর	—	১৭ পয়সা।
আবগারি শুল্ক	—	৭ পয়সা।
পুঁজির বিনিয়োগ থেকে আয়	—	৬ পয়সা।
অন্য শুল্ক	—	৪ পয়সা।
অন্যান্য রাজস্ব	—	১০ পয়সা।
		মোট ১০০ পয়সা

(সারণি ১ দ্রষ্টব্য)

উপার্জন যদি অপর্যাপ্ত হয়, সরকারের পক্ষে ইত্যাকার দায় বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। *(সারণি-১ দ্রষ্টব্য)* ফলে আয়ের উপায় সরকারকে বের করতেই হবে, বিরোধীরা যতই দোষারোপের ঝড়কে সাঙ্গোপাঙ্গদের সাহায্যে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করে যাক-না কেন। এর বিপরীতে একটি আর্থিক বছরে সরকার যদি নিছক জনমোহিনী বাজেট উপস্থাপিত করে সংসদে, তা যে প্রকারান্তরে দেশের বুনিয়াদকেই নড়বড়ে অবস্থায় টেনে আনে, তা বোঝাতে কোনো অর্থনীতির প্রফেসরকে ডেকে আনবার দরকার নেই। আমার অভিজ্ঞতা বলে, সচরাচর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে ক্ষমতাসীন সরকার ওই রকম জনমোহিনী বাজেট পেশ করে থাকে সাধারণ মানুষের আশু সমর্থন লাভের প্রত্যাশায়। বাজেটকে লালিপপ বানিয়ে নির্দোষ নাগরিককে আকর্ষণ করবার চেষ্টায় সঠিক অর্থনীতি বিলকুল বেঠিক হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বিত্তমন্ত্রীর সেই ফাইলটাও আর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকে না। দয়াদাক্ষিণ্যের সমারোহে ভারসাম্যহীনতার শ্রেণীবদ্ধ বিস্তার ঘটে। ২০২০-২১ আর্থিক বছরের বাজেটপ্রস্তাবটি যে ভোটে জেতার গণপ্রণাম মন্ত্র হয়ে ওঠেনি, তার জন্য নির্মলা সীতারামনকে ধন্যবাদ। প্রত্যাশার চাপ কিন্তু ছিল যথেষ্ট। এমন চাপ যে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করা গণতান্ত্রিক দেশে বেশ কঠিন। প্রত্যাশা যাদের সর্বাধিক, তারা মুখ্যত মধ্যবিত্ত। ফস্টারহোমে লালিত যথার্থ দরিদ্ররা নন। আবার এ কথাও এ দেশের সকল রাজনীতিকই জানেন, ভারতবর্ষে মধ্যবিত্তের হৃদয় যদি ছোঁ মেরে না তোলা যায়, ভোটযুদ্ধে ভরাডুবি প্রায় অনিবার্য। তদনুযায়ী নেতা-নেত্রীদের এমনই ভাষণ-টাষন দেন, হরেক কিসিমের সোশ্যাল ওয়ার্কের ভনিতাও করেন। তবে এ কথা ভাবলে ভীষণ ভুল হবে যে মধ্যবিত্তরা বুঝি একাত্মবোধে বিভোর। বরং এর উলটো। প্রত্যাশার বহর নিয়ে সবচেয়ে বেশি বাদানুবাদ তাদেরই। এককাট্টা মধ্যবিত্তদের আমরা কদাচিৎও দেখতে পাই না।

আলোচ্য বাজেট নিয়ে সবচেয়ে বেশি কৌতূহল ছিল মধ্যবিত্তের। বাজেট পেশের আগে যখন যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, শুনতে পেয়েছি সেই এক প্রশ্ন, 'দাদা, কী মনে হচ্ছে? মোদী সরকার নিশ্চয় আয়করে বড়ো ছাড় দিতে চলেছে।' এর বাইরে সহসা আর কোনও জিজ্ঞাসা আসেনি। এমনকী, যে নাগরিক পঞ্জীকরণ নিয়ে বিরোধীদের শরীর মন অসাড় করা চিলচিৎকার, তা নিয়েও বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। মনে হবে, মোদীজী যেন মধ্যবিত্তকে কথা দিয়েছেন, আয়করে এবার বিশাল ছাড় আসছে। যদি আসে, মধ্যবিত্তদের একজনও অন্যমনস্ক থাকবেন না দু'হাত তুলে জয়ধ্বনি দিতে। সুতরাং বাজেটের বিশ্লেষণে বসলে প্রথমেই চলে আসে আয়করের প্রসঙ্গ। কিন্তু আমি হুটপাট করে আয়করের ব্যাপারটাকেই সর্বাগ্রে টেনে

আনতে নারাজ। বরং এই প্রসঙ্গটাকে নিয়ে আসতে চাই শেষ পর্বে। আয়করের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে আমাদের সামনে। নিজস্ব স্মৃতিচারণেও আমি এই চর্চাটাতে বরাবর আবেগশূন্য। যতই বিবৃতি দেওয়া হোক, বাস্তবে এ দেশের ক'টা মানুষের ওপর আয়কর ধার্য করা হয়? শতাংশের হিসেবে অতি, অতি নগণ্য। এখানে আমি সেই বিষয়গুলিকে নিয়েই প্রথমে চর্চা করব, যেগুলি প্রায় সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থিক পরিস্থিতির আদত ছবিটাকে তুলে ধরে। কোনটা ইতিবাচক, কোনটা নেতিবাচক, কোনটা কোমল, কোনগুলি ক্রূর ভয়ংকর— সময়ানুক্রমে তাদের চিহ্নিত করাটাই মুখ্য কর্তব্য বলে মনে করছি :

(১) আজও এদেশের শতকরা ৭০ ভাগ পরিবার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কৃষিনির্ভর। সুতরাং দেশে যথার্থ উন্নয়নের পরিবেশ উদ্ভূত হবে তখন, যখন দেখা যাবে যে সরকার সাদরে কৃষকদের অবস্থা ফেরাতে টাকা ঢালছে। এই উপলব্ধির দৃঢ় ও তৎপর অবস্থান প্রত্যক্ষ করা গেল নির্মলা সীতারামনের বাজেট প্রস্তাবে। প্রায় তিন লক্ষ কোটি টাকা চাষিদের কল্যাণে বরাদ্দ করা হয়েছে। আজ অবধি দেশের কোনও সরকার কৃষকদের জন্য এত টাকা বরাদ্দ করেনি। বিপুল অঙ্কের এই অর্থের সঠিক ব্যবহারের স্বার্থে ১৬টি বিশেষ পদক্ষেপ নিতে চলেছে সরকার। ২.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়িত হবে কৃষির সঙ্গে যুক্ত গ্রামোন্নয়নেও। আস্থা রাখছি, ২০২২ সালের মধ্যে ভারতের কৃষিনির্ভর পরিবারগুলির উপার্জন দ্বিগুণ হবে।

(২) জিএসটি রিটার্নের জটিলতা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ আমরা গত কয়েকবছর ধরে শুনে আসছি। আমার অন্তরঙ্গ একাধিক ব্যবসায়ীও অনুরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এবার সেইসব জটিলতা এপ্রিল মাসের মধ্যেই মুছে যাবে বলে নির্মলাদেবী তাঁর বাজেট প্রস্তাবে জানালেন। জিএসটির বিরুদ্ধে যে যতই গলাবাজি করুক, এ কথা অনস্বীকার্য যে, দেশে জিএসটি চালু হওয়াতেই লালশালুর ওপর দাঁড়ানো সন্দেহজনক ও দুর্গন্ধময় 'ইন্সপেক্টর রাজ' দেশ থেকে একরকম মুছেই গিয়েছে।

(৩) গৃহী পুরুষ মহিলা শিশু সকলেরই অন্যতম প্রাত্যহিক সমস্যা হলো পরিবহণ। রাজ্য ও কেন্দ্র— উভয় স্তরেই সাধারণ মানুষের যুগপৎ সরব ও নীরব প্রতিবাদ ও অনুনয় পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবিতে। প্রস্তাবিত বাজেটে জল স্থল ও আকাশ পরিবহণে নবযুগ আনয়নের প্রতিশ্রুতি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা লক্ষণীয়। বাজেটীয় প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দেশে নির্মিত হবে ১০০টি নতুন বিমানবন্দর। ছুটবে ১০০টি নতুন দূরপাল্লার ট্রেন। গঙ্গা সমেত অধিকাংশ বড়ো বড়ো নদীতে ও বন্দরে জলযানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে অনেক পরিবহণের দাবি মেটাতে। ২৫ হাজার নতুন সড়কপথ নির্মাণের রূপরেখা রচিত হয়েছে প্রস্তাবিত বাজেটে। ২৭ হাজার কিলোমিটার রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ সমাপ্ত হবে ২০২৪ সালের মধ্যে। সৌরশক্তির ব্যাপক প্রয়োগও ঘটবে ওই প্রকৃত উন্নয়নয়নে। দেশের প্রধান প্রধান পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে যেন এক সুতোয় বেঁধে রাখবে তেজস এক্সপ্রেসের সমকক্ষ বেশ কতগুলি সেমি-হাইস্পিড যাত্রীবাহী ট্রেন। দিল্লি-মুম্বাই এক্সপ্রেসওয়ে চালু হয়ে যবে বছর তিনেকের মধ্যেই।

(৪) মুক্ত ও স্বচ্ছ আবহে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা জম্মু ও কাশ্মীরের সার্বিক উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করবার পথে চলতি আর্থিক বছরে সরকার ব্যয় করবে বিপুল পরিমাণ অর্থ— ৩০ হাজার ৭৭০ কোটি টাকা। কাশ্মীরের পর্যটন শিল্প যেমন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে, তেমনি কাশ্মীরের নিজস্ব শিল্প উলেনগুডস, আপেল, মুখরোচক খোবানি ইত্যাদির চাহিদা হয়ে উঠবে সর্বভারতীয়; রপ্তানি হবে দেশের বাইরেও।

(৫) সংসদে বিত্তমন্ত্রী শোনালেন এমন এক প্রস্তাব, যার সমর্থনে জয়ধ্বনিতে মুখরিত হবে দেশের দলিত ও তপশিলিরা। তাদের কল্যাণে এক বছর সময়সীমায় এই সরকার ব্যয় করবে ৮৫ হাজার কোটি টাকা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মলাভ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই এই শোষিতদের জীবনযাত্রায় সূচিত হবে বৈপ্লবিক শুভ অগ্রগমন।

(৬) ইন্টারনেট পরিষেবার প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম প্রথমাবধি। এবারের বাজেটে তাই ওই পরিষেবার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীরই মানসমূর্তিটি যেন প্রতিফলিত। এক লক্ষ গ্রামপঞ্চায়েতে আসছে অপটিক্যাল ফাইবার। বরাদ্দ হয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকা। গ্রামের সঙ্গে শহর ও নগরের যোগাযোগ নিজস্ব প্রসারণশীলতার মাধ্যমে গড়ে ওঠার কথা বলেছেন বিত্তমন্ত্রী। নব ভারত গঠনের যে কথা বহু বছর ধরে আমরা শুনে আসছি, এবার শুরু হলো তার আধুনিকপর্ব।

(৭) অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মধ্যম মাপের শিল্পসংস্থাগুলির বর্তমান পরিস্থিতি যে যথার্থ সুখকর নয়, অধিকাংশ পূর্ণদৈর্ঘ্যের সংবাদপত্র ও ট্যাবলয়েডে তা প্রায়শ আলোচিত হচ্ছে। নব্য প্রযুক্তির প্রয়োগও তার যথার্থ আধুনিক অবয়ব দেখাতে পারছে না। নির্মলা সীতারামন এমত পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে সরকারের যে জানকবুল, তা ঘোষণা করলেন সংসদে দাঁড়িয়ে। সত্যি যদি অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মধ্যমমাপের শিল্প প্রসারতা লাভ করে, কর্মসংস্থানেরও পরিধি বাড়বে এবং দেশের যুবশক্তিকে প্রকৃতই শামিল করা যাবে শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবার আরতিতে। অবশ্য এই ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকার পর্যালোচনা কাম্য ছিল। শুধু পকেটে একাধিক কার্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ালেই চলবে না। শিহরণ সৃষ্টিকারী নজরদারি দরকার শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে। বিত্তমন্ত্রী কথা দিয়েছেন, আগামী ১ এপ্রিল থেকে জিএসটি রিটার্নকে সরল করা হবে। এই রিটার্ন সাবমিট করতে গিয়ে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের আর বিচলিত হতে হবে না।

(৮) কৃষিতে সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈবশক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দিতে সীতারামন কৃষকদের আহ্বান ও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

(৯) বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম নির্মাণে দেশীয় প্রযুক্তির ওপর জোর দিয়েছে বাজেট প্রস্তাব। চিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদি অতঃপর যাতে সম্পূর্ণভাবে দেশেই তৈরি হয়, তার জন্য সরকারি

সহায়তা আসবে নানা পথ ধরে।

(১০) দেশে দূষণের মাত্রা কমাতে বিত্তমন্ত্রী নাগরিকদের আরও বেশি সচেতন ও সামাজিক হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি প্রত্যাশা করেন, দলমত নির্বিশেষে সকলেই এই সচেতনতার শামিল হয়ে উঠবেন। বায়ুদূষণকে নিষ্ক্রিয় করতে তাঁর বিশেষ প্রতিশ্রুতির নাম 'ক্লিন এয়ার পলিসি'। সেই পলিসিকে সফল করতে বাজেটে তিনি রেখেছেন প্রচুর পরিমাণ অর্থ— ৪ হাজার ৪ শো কোটি টাকা। ভারতের পূর্ববর্তী বিত্তমন্ত্রীগণ তাঁদের বাজেট ভাষণে বিস্তর কাগজের গোছা নিয়ে এলেও এই বিষয়টা নিয়ে তেমন মাথা ঘামিয়েছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই।

(১১) দেশের আর্থিক বুনিয়াদকে পোক্ত করবার অন্যতম উপায় রপ্তানির পরিমাণে বৃদ্ধি আনয়ন। এর জন্য যদি শিল্পমহলকে ঋণ সমেত বিবিধ সহায়তা না দেওয়া যায়, লক্ষ্যভেদ কার্যত অসম্ভব। কোনো সংস্থার কী বস্তু নির্মাণে খ্যাতি, তা খুঁটিয়ে দেখতে হবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে। এই কাজে সাফল্য আনতে নির্মলা সীতারামন তাঁর বাজেট প্রস্তাবে নিয়ে এলেন এক নতুন দিশা, নাম যার 'নির্ভীক'। বক্তৃতার সময় ইমোশনালি তিনি কয়েকবার 'নির্ভীক' শব্দটিকে জোরের সঙ্গে উচ্চারণও করেন। এ যেন শবব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে প্রকৃত রোগটিকে খুঁজে বের করা। এই প্রকল্পে অতঃপর বলীয়ান হয়ে ক্ষুদ্র রপ্তানীকারীরা অনেক কম প্রিমিয়াম দিয়ে যথেষ্ট বৃহৎ বিমার সুবিধা পাবেন। ইত্যাকার সিস্টেমে 'ক্লেম' লাভের প্রক্রিয়াকেও করা হবে সরলতর। দেশের সর্বত্র রপ্তানিকারক সংস্থাগুলিকে পণ্যপরিবহণের সুবাদে যে জ্বালানি মূল্য ও বিদ্যুৎবিল মেটাতে হয়, এবার সরকারই সচেষ্ট হবে ওই ব্যয়ভারকে অনেকটাই লাঘব করতে। আদতে 'নির্ভীক'-এর নির্ভীকতায় সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন দেশের ছোটো ছোটো রপ্তানিকারীরা।

(১২) এবারের বাজেটকে নারী ও শিশুদের প্রতি কেবলমাত্র উদার ও দয়াবান বললে বিশ্লেষণ খামতি থেকে যাবে। পরিবর্তে নারী ও শিশুদের বাস্তবসম্মত উন্নয়নে সরকার যে একরকম নাছোড়বান্দা, সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে নিম্নোক্ত তিনটি প্রতিশ্রুত প্রকল্পে :

(ক) পোষণ অভিযান। (খ) ধনলক্ষ্মী (স্বনির্ভর গোষ্ঠী)।

(গ) কল্যাণদায়ী শক্তিমহড়া (টাস্ক ফোর্স)।

'পোষণ অভিযান'-এর মূল লক্ষ্য, একদিন থেকে আরম্ভ করে ৬ বছর বয়স অবধি শিশুদের শারীরিক পুষ্টি ও মানসিক বিকাশের অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত রাখা। এই দেশের অধিকাংশ শিশুই যে অপুষ্টির শিকার, এটা গত ৭৩ বছরের এক মহা ব্লেমিশ, কলঙ্ক। এই প্রথম দেশের বাজেট প্রস্তাবে তা স্বীকার করা হলো এবং পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে সরকারি সহায়তার কথা বলা হলো। বিত্তমন্ত্রীর শপথ, ২০২২ সালের মধ্যে অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যা ৩৯ শতাংশ থেকে নামিয়ে ২৫ শতাংশে আনতেই হবে। এর জন্য প্রতি বছর সরকার ব্যয় করবে ৩০০ কোটি টাকা।

মহিলাদের সন্তান ধারণের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণের জন্য অবিলম্বে গঠিত হবে একটি টাস্কফোর্স। ৬ মাসের মধ্যে উক্ত টাস্কফোর্স তাদের রিপোর্ট জমা দেবে। শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে যে হারে মহিলাদের মৃত্যু ঘটছে এদেশে, সরকার তা হ্রাস করতে বদ্ধপরিকর। আর 'ধনলক্ষ্মী' হলো মহিলাদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত 'স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির দ্বারা নির্মিত দ্রব্যাদি বাজারজাত করতে সরকার সাধ্যানুসারে সাহায্য করবে।

সারণি-১

সরকারের ওই ১০০ পয়সার ব্যয়ের হিসেবটা এই রকম :

ব্যয়ের ক্ষেত্র		পরিমাণ
ঋণের আসল ও সুদ মেটাতে	—	২২ পয়সা
কর ও শুল্কে রাজ্যের ভাগ	—	১৬ পয়সা
প্রতিরক্ষা	—	৮ পয়সা
পেনশন	—	৬ পয়সা
ভরতুকি	—	৬ পয়সা
অর্থ কমিশনসম্মত বেতন বাবদ	—	১০ পয়সা
বিভিন্ন প্রকল্পে স্পনসরশিপ	—	৯ পয়সা
বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বিনিয়োগ	—	১৩ পয়সা
অন্যান্য খাতে	—	১০ পয়সা
	মোট—	১০০ পয়সা

(১৩) অতঃপর আসছি আয়কর প্রসঙ্গে,— যে বিষয়টির দিকে সচরাচর তাকিয়ে থাকেন চাকুরিজীবী সমেত মধ্যবিত্তরা। বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রত্যাশা ছিল, নির্মলাদেবীর প্রস্তাবিত বাজেটে আচমকাই মিলে যাবে যেন একরাশ মণিমুক্তা এবং তাঁরা খুব জাঁক করেই উপভোগ করবেন সেই প্রাপ্তিযোগকে। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য করলাম, বহু পরিচিত করদাতার চোখেমুখে বিভ্রান্তি ও হতাশা। অনেকে আবার এই সুযোগে বিজেপি সরকারকে দুয়োও দিলেন।

আদতে এই বিষয়টা আমাদের গভীর মনোযোগও দাবি করে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা অবধি উপার্জনের ওপর করের হার সর্বাধিক ১০ শতাংশ কমাবার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ওই সুবিধা যদি আপনি নিতে চান, তাহলে আপনাকে সঞ্চয় তথা বিনিয়োগের মাধ্যমে এতদিন যে কর ছাড়ের সুবিধা পাচ্ছিলেন, তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আয়করের বিভিন্ন ধারামোতাবেক যথা, পিপিএফ-এ টাকা রাখা, গৃহঋণের আসল পরিশোধ বাবদ ব্যয়, জীবন বিমার প্রিমিয়াম প্রদান বাবদ ব্যয়, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ন্যূনতম ৫ বছরের ফিক্সড ডিপোজিট করা ইত্যাদি যোগে সর্বাধিক ১.৫ লক্ষ টাকা অবধি যে করছাড় পেতেন, তা আর থাকবে না। স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়াম বাবদ সর্বাধিক ২৫ হাজার টাকার ছাড়ের কথাও আপনাকে ভুলে যেতে হবে। এবার হিসেব কষে দেখুন, অত সমস্ত সুবিধা ছেড়ে দেবার পরও আপনি লাভবান হচ্ছেন কিনা? যদি হয়ে থাকেন, নতুন নিয়মকে মেনে নিন। অন্যথায় আঁকড়ে ধরে থাকুন, অন্তত একটি আর্থিক বছরের জন্য, বর্তমান আয়কর বিধানকেই। চলমান এবং আগুয়ান— এই দুইটির মধ্যকার প্রভেদ বুঝতে গিয়ে আমি পরে দেখলাম, অনেক মানুষই ছোটাছুটি, ঠেলাঠেলি করছেন প্রস্তাবের

সারণি-২

দ্বি-বিধ করকাঠামোটা এই রকম :

করযোগ্য উপার্জন	**পুরানো ব্যবস্থায় করযোগ্য আয়ের কত শতাংশ কর হিসেব দেয়**	**নবীন ধারায় কর প্রদানের হার**
২.৫ লক্ষ টাকা অবধি	কর নেই	কর নেই
উপার্জন যখন সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা	৫ শতাংশ	৫ শতাংশ
উপার্জন যখন ৫ লক্ষ টাকার অধিক, কিন্তু ৭.৫ লক্ষ টাকার কম	২০ শতাংশ	১০ শতাংশ
উপার্জন যখন ৭.৫ লক্ষ টাকার অধিক, কিন্তু ১০ লক্ষ টাকার বেশি নয়	২০ শতাংশ	১৫ শতাংশ
উপার্জন যখন ১০ লক্ষ টাকার বেশি, কিন্তু ১২.৫ লক্ষ টাকার অধিক নয়	৩০ শতাংশ	২০ শতাংশ
উপার্জন যখন ১২.৫ লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে অনধিক ১৫ লক্ষ টাকা	৩০ শতাংশ	২৫ শতাংশ
উপার্জন যখন ১৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে	৩০ শতাংশ	৩০ শতাংশ

চলতি ব্যবস্থায় করমুক্তির যে সকল ছাড় করদাতারা পেয়ে থাকেন, তাদের বিবরণ :

	টাকা
স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন	৫০,০০০.০০
৮০ সিসি ধারা অনুযায়ী পিপিএফ, জীবনবিমার প্রিমিয়াম, গৃহঋণ পরিশোধে টাকা দেওয়া ইত্যাদি সাত-সতেরো	১,৫০,০০০.০০
গৃহঋণে প্রদত্ত সুদ বাবদ ছাড়	২,০০,০০০.০০
স্বাস্থ্য বিমায় প্রদত্ত প্রিমিয়াম	২৫,০০০.০০
ন্যাশনাল পেনশন স্কিম বাবদ	৫০,০০০.০০
মোট ছাড়—৪,৭৫,০০০.০০	

তাৎপর্য বুঝতে। স্বস্তিতে আত্মহারা হবার বদলে কপালে গভীর কুঞ্চন। এই প্রজন্মের করদাতাদের কাছে আয়করের এমন দ্বিবিধ ফর্মূলা যুগপৎ অভিনব এবং বিভ্রান্তিকর। *(সারণি-২ দ্রষ্টব্য)*

নতুন প্রস্তাবিত করকাঠামোয় এই ছাড়গুলির একটিও থাকছে না। অর্থাৎ প্রত্যাশার হাউইবাজি প্রত্যাশিত উচ্চতায় আদৌ পৌঁছাল না। বলতে আমার সঙ্কোচবোধ নেই, আয়করের নতুন নিয়ম পুরোদমে চালু হয়ে গেলে মধ্যবিত্তের সঞ্চয়প্রবণতা কিন্তু হ্রাস পাবে। আরও একটি বিষয় কিন্তু অনভিপ্রেত। তাহলো এই যে, করদাতারা কে কোন নিয়মে কর দেবেন, সেই বিষয়ে সার্বিক স্বাধীনতা থাকছে না। অতি সম্প্রতি আরও বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে অবহিত হলাম যে, একমাত্র যাঁরা চাকরিজীবী, তাঁরাই করকাঠামোর ওই দুটি নিয়মের যে কোনও একটিকে বেছে নিতে পারছেন। যাঁরা বাণিজ্যে রত, তাঁরা ইচ্ছা মতো আয়কর জমা দেবার পদ্ধতি বদলাতে পারবেন না। যে পদ্ধতি তাঁরা একবার বেছে নেবেন, সেটাকেই মান্যতা দিয়ে যেতে হবে আগামী দিনগুলিতেও। 'মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান মি: অরবিন্দ আগরওয়াল জানালেন, 'আয়করদাতাদের মধ্যে ব্যবসায়ী এবং পেশাদারদের সরকার একই পংক্তিতে রেখেছে। তাই যে নিয়মে ব্যবসায়ীরা ট্যাক্স দিচ্ছেন, সেই একই নিয়মে বন্দি থাকছেন ডাক্তার, চারটার্ড অ্যাকাউন্টেট প্রমুখ পেশাদারও।' মোটের ওপর এবারের বাজেট প্রস্তাবে আয়কর ধার্যের ও আদায়ের যে বিন্যাস করা হয়েছে, তা বহু করদাতারই না পছন্দ। কিছু মানুষকে 'খুব' বিচলিত অবস্থাতেই দেখলাম।

(১৪) বিতর্ক জমিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সমেত আরও কিছু ব্যক্তিত্ব এল আই সি-র শেয়ার বিক্রির প্রস্তাবটিকে নিয়ে। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে আমার মনে হচ্ছে, এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঝড় তোলার কোনও কারণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। এক সময় বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্কেরও কিছু শেয়ার খোলা বাজারে ছাড়া হয়েছিল। আমি নিজেও কয়েকটি শেয়ার কিনে লাভবান হই। কিন্তু ওই ব্যবস্থায় স্টেট ব্যাঙ্কের সরকারি অধিকারে সামান্যতম আঁচড়ও লাগেনি। এল আই সি-র খোদ চেয়ারম্যান মি. এম আর কুমার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিলেন, 'এলআইসি-র বেসরকারিকরণ আদৌ হচ্ছে না। সমস্ত Policy-তেই Sovereign Guarantee অটুট থাকছে। সরকার তার শেয়ারের সামান্য একটি অংশকে বিলগ্নীকরণের কথা ভাবছে। এটা নতুন কিছু নয়। এর বহু আগে একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও বিমার ক্ষেত্রেও এই রকম অল্পস্বল্প শেয়ার বিক্রি করেছে সরকার। অপপ্রচারে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না।' সব মিলিয়ে বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের দীর্ঘ বাজেট প্রস্তাব অনন্য। বিস্তারিত বিশ্লেষণের হকদার। ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মি: মায়ঙ্ক তাঁর প্রতিক্রিয়া জানালেন এই ভাবে—

'...এই অতি দীর্ঘ বাজেট প্রস্তাবটি প্রকৃতই ঐতিহাসিক গুরুত্বের দাবি রাখে। বিত্তমন্ত্রীর জ্ঞান, পর্যবেক্ষণ, অনুধাবন, বাস্তববোধ ও সহমর্মিতা আমাদের আপ্লুত করেছে। তিনি দেশের বর্তমানকে যথাসাধ্য চাঙ্গা করে তোলার দাওয়াই বাতলালেন ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে। বিশ্ব এখন হরেক সমস্যায় জর্জরিত। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এই বাজেটটি সত্যি ব্যতিক্রমী। আমরা প্রত্যয় রাখতেই পারি।'

বাংলাদেশে হিন্দু কন্যা অপহরণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা ক্রমাগত ঘটেই চলেছে, শুধুমাত্র এটাই নয় অত্যাচার, নির্যাতনের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ সে দেশের সরকারের নিষ্ক্রিয়তা। তাই দুষ্কৃতীরা ক্রমশ সাহসী হয়ে উঠছে এবং দুষ্কর্ম চালাচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি সংবাদের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এক হিন্দু নাবালিকা ঐশী চৌধুরীর রহস্যজনক অপহরণকে কেন্দ্র করে গত শুক্রবার (৩১.০১.২০২০) চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত দোহাজারী পৌর এলাকায় বাংলাদেশ মাইনরিটি ওয়াচ তদন্ত শুরু করেছে। নাবালিকা ঐশী চৌধুরীর প্রকৃত বয়স ১৫ বছর জন্ম সনদ অনুসারে। এই বছরে মেয়েটি এস এস সি পরীক্ষা দেবে। দোহাজারী জামিরজুরি এ রহমান বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। নাবালিকা মেয়েটির বাড়ি চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার দোহাজারী এলাকায়। পিতা রূপেন চৌধুরী কর্মসূত্রে দেশের বাইরে থাকেন। মা গৃহবধূ, ১ ভাই আর ৩ বোন। অপহৃতা মেয়েটি সবার বড়ো। মেয়েটির মা সীমা চৌধুরী অপহরণের পর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি লিপিবদ্ধ করেন। ডায়েরি নং ৭৮৫ তারিখ ২২.০১.২০২০। কিন্তু মেয়ের বয়স দেখানো হয়েছে ১৯। মেয়ের মা BDMW-কে বলেন আমার মেয়েকে মুসলমানরা অপহরণ করতে পারে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি। এ ধরনের হিন্দু কন্যা অপহরণের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
বড়বাজার, চন্দননগর-৭১২১৩৬।

একটু সংযোজন

স্বস্তিকার ২৬ জানুয়ারি সংখ্যার 'প্রতিবেদন' ও 'স্মরণে' অসীমদা (অসীমকুমার মিত্র) সম্পর্কে তাঁর জীবনের বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর বিবরণ রয়েছে। তিনি সাংবাদিক তথা সঙ্ঘজীবনে যেসব গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন তা আমরা জানতে পারলাম। 'স্মরণে' থেকে এটাও জানা গেল যে তিনি পিতার হাত ধরে শৈশবে সঙ্ঘে প্রবেশ করেছেন— যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে আমার জানার আগ্রহ যে তাঁর বাল্যজীবন, জন্মস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে দুটি ক্ষেত্রেই তেমন কিছু পাওয়া গেল না। এখানে আমি সংযোজন করতে চাই যে, ভোলাদা কল্যাণী ভ্রমণকালে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলেছিলেন। ভোলাদা (অসীমবাবুর ডাকনাম) বললেন, ''আমার জন্ম খুলনা জেলার বাগেরহাট সাবডিভিশনের যাত্রাপুর গ্রামে। কালিমাময় ভারত- বিভাজনের পর এক গভীর রাতের অন্ধকারে নৌকাযোগে মা-বাবা-ঠাকুমা এবং পরিবারের অন্য সদস্য-সহ এদেশে চলে আসি। আমি তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি।'' এই প্রসঙ্গে অন্য কারো কিছু জানা থাকলে বা অসীমদার বাল্যকাল এবং এদেশে আসা সম্পর্কে কোনো তথ্য লিখে পাঠালে স্বস্তিকার পাঠকরা উপকৃত হবেন।

উল্লেখ্য, আমার জন্মস্থান বর্তমান বাংলাদেশের বাগেরহাটের প্রতাপপুর গ্রামে।

—সুনীল কুমার মুন্সী,
কল্যাণী নদীয়া।

রাষ্ট্রবাদী দল জিতলে ইভিএম হ্যাক হয়

প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দল জিতলে একটি আওয়াজ কানে আসে ইভিএম হ্যাক হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের ত্রুটি নিয়ে। আর অন্য দল জিতলে বা পাকিস্তানপন্থীরা জিতলে সবাই মৌনীবাবা সাধক হয়ে যায়। পাকিস্তানপন্থীদের জন্য বিদেশ থেকে টাকা আসে। দেশে হাঙ্গামা বাধানোর দোসরের অভাব হয় না। সবাই জেতাটাই শুধু দেখে, কীভাবে জিতছে, কেন জিতছে এ প্রশ্ন কারোই মনে আসে না। অবশ্য সাধারণ লোকের এ ব্যাপারটা



বোধগম্য হবার কথা নয়। খুঁটিয়ে দেখে বুদ্ধিমানেরা। অন্যরা হাওয়ায় চলে। দেশে জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী ৭০ বছর আগের তালেই চলেছে। সেটা না হলে কীভাবে পাকিস্তানপন্থীরা পাকিস্তানের ধ্বনি দেয়, পাকিস্তানের সবুজ নিশান উঠায়। অসমে ছাব্বিশে জানুয়ারি সবুজ গামছাকে পতাকা বানিয়ে বিদ্রোহের সূচনা করে। দিল্লিতে বসে অসমকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দেয়। দিল্লির জয়ে পাকিস্তানপন্থীদের আনন্দের বহর ছোটে। এক রাজ্যের জয় অন্য রাজ্যের ফুর্তি, এ সব কিছুই রাষ্ট্রবাদের পরিপন্থী বলে মনে হয়। এতেও কিছু মানুষের তৃপ্তি হয় না, প্রধানমন্ত্রীকে অবমাননাকর কথা বলতে পিছু পা হয় না। ভারতবর্ষের মতো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এই সম্ভব। পাশের বাংলাদেশে এমন ঘটনা আশা করাই অলীক বলে মনে হয়। হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা না হলে এমন ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটতেই থাকবে বলে মনে করি।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

আজাদির আড়ালে

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদে পাশ না হলে কানাইয়া কুমারের মুখনিঃসৃত বাণী 'আজাদি'র আসল রূপটা এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ পেত না। আপামর ভারতবাসী জানতেই পারতো না আজাদির নামে ভারত ভাঙার চক্রান্তের কথা। অসমসহ গোটা উত্তর পূর্ব ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার কথা। আমরা কেউ জানতেই পারতাম না হিন্দু সমেত অন্য সব ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে সমগ্র ভারতবর্ষকেই ইসলামি দেশে পরিণত করার কথা। মুসলমানদের এই পরিকল্পনার মধ্যে তো কোনো আশ্চর্যের বিষয় নেই। কারণ এটাই তো ইসলামের ঘোষিত নীতি।

মুসলমানরা যখন যে দেশে যতদিন সংখ্যালঘু ততদিন তারা ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী, আর সংখ্যাগুরুতে পরিণত হলে তখন তারা সর্বগ্রাসী।

মুসলমানরা ধর্মের নামে দেশভাগ করার পরও ভারতের হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন এবং বৌদ্ধরা কিন্তু তাদের এদেশে আপন করে নিয়েছে। হিন্দু মুসলমান সমেত সব ধর্মের মানুষ এই ভারতেই সন্তান, এই বিশ্বাস ও ভাবনাকে মন্ত্রের মতো ভেবে একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গড়া হয়েছিল। কিন্তু আজ স্বাধীনতার ৭০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে এতদিন যে ধারণা ও ভাবনাকে আমরা মন্ত্রের মতো সাধন ও ধারণ করে এসেছি তা আসলে সম্পূর্ণ মিথ্যা। যে মুসলমানরা ভারতমাতার অঙ্গহানি করে সম্পূর্ণ নিজেদের জন্য একটা দেশ পাকিস্তান সৃষ্টি করেও এদেশে থেকে গিয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী চাপিয়ে, তাদের মুখোশ আজ খসে পড়েছে। আসলে সেইদিন তারা যে এ দেশে রয়ে গিয়েছিল একটা গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে, তা আজ দিল্লির শাহিনবাগ, কলকাতার পার্কসার্কাস থেকে হাওড়া, মুম্বাই থেকে বাঙ্গালুরু এবং দেশের বিভিন্ন শহরে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা ও দাবি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আসলে এদের মুখে ধর্মনিরপেক্ষতা আর সংবিধান, কিন্তু মস্তিষ্কে গজওয়া হিন্দুস্থান।

শরজিল ইমাম, ফয়জুল হাসানরা আজ সারা দেশের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এ দেশের মুসলমানদের স্বপ্ন কী। ভারতবর্ষকে ইসলামি দেশে পরিণত করার স্বপ্ন। তারা দীর্ঘদিন ধরেই জে এন ইউ, জামিয়া মিলিয়া, এ এম ইউ-তে বসে ভারত ভাঙার পরিকল্পনা রচনা করে চলেছে। শুধু তাই নয়, শরজিলের স্বপ্নকে সার্থক করার অঙ্গীকার করা হচ্ছে মাইক হাতে উন্মুক্ত মঞ্চে। জিন্নার আজাদির স্লোগান উঠছে। রামমন্দিরের রায় মুসলমানদের সপক্ষে না হওয়ায় ভারতের বিচার ব্যবস্থাকেই আজ তারা মান্যতা দিতে নারাজ। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ বাম, কংগ্রেস থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠন এবং সর্বোপরি বুদ্ধিবিক্রির ফিরিওয়ালারা এই দেশ ভাঙার কুচক্রীদের বিরুদ্ধে একটিও শব্দ উচ্চারণ তো দূরে থাক নির্লজ্জের মতো কখনও প্রকাশ্যে আবার কখনও আড়ালে থেকে ওই দেশবিরোধীদের সমর্থন জোগাচ্ছে। এই সমর্থনকারীদের কাছে জিন্না-আজাদির অর্থটা জানতে চাই। জানতে চাই তারাও কি জিন্না-আজাদির সমর্থক? তারাও কী ভারতকে একটি ইসলামিক দেশ বানাতে চায়। দয়া করে তারা এই বিষয় স্পষ্ট মত দিলে দেশ উপকৃত হবে।

সিএএ বিরোধী সভায় আজ ভারতের জাতীয় পতাকা ও সংবিধান হাতে নিয়ে ভারতকেই ভাঙার চক্রান্ত চলছে। কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন করার ডাক দিচ্ছে। রাজধানীর রাজপথকে কবজা করে সুভাষচন্দ্র বসু, আম্বেদকর, এপিজে আব্দুল কালাম ও গান্ধীজীর ছবি হাতে নিয়ে আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা বিশেষ ধর্মীয় পরিচয় বহনকারী মহিলাদের মুখে যখন শুনছি ধর্মনিরপেক্ষতা, সংবিধান রক্ষা ও আজাদির কথা, তখন কিন্তু এই আজাদির অর্থ নিয়ে একটু অন্যরকম ভাবতে হচ্ছে। এরা তিন তালাক থেকে আজাদি চায় না। আসলে এরা ইসলামের শরিয়াতের অনুশাসনে ভারতকে অন্ধকারের গহ্বরে নিক্ষেপ করতে চায়।

এদের কাছে আজাদির অর্থ হলো, সব ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে ভারতবর্ষকে ইসলামি দেশে পরিণত করা।

আজ আমরা সারা দেশে যে আগুন জ্বলতে দেখছি তা কিন্তু ভারতের ভবিতব্যই ছিল। যেদিন ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ মেনে নিয়েও ধর্মভিত্তিক জনবিনিময় করা হয়নি, সেদিনই সলতে পাকানো হয়েছে আজকের এই অশান্তির আগুনের। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রস্তাব মতো দেশভাগের সময় জনবিনিময় সঠিক ভাবে সম্পন্ন হলে ভারতবর্ষের আজ না প্রয়োজন হতো নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, না জ্বলতো অশান্তির আগুন।

—শ্রীরাধা কৃষ্ণত্রয়,
বাঘাযতীন,
কলকাতা-৮৬।

পুরস্কার বিক্রি করবেন না

গাল্লি বয় নামের একটি হিন্দি ছবি এ বছর তিনটি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়েছে। এই ছবির নায়ক রণবীর সিংহ প্রতিযোগিতায় সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন এবং নায়িকা আলিয়া ভাট পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার। ছবিটি পেয়েছে সেরা সিনেমার পুরস্কার। ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, কোন যুক্তিতে ছবিটিকে সেরা সিনেমা হিসেবে বিবেচনা করা হলো? ছবিতে এক সাধারণ মুসলমান যুবকের জীবনযুদ্ধের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, এই ধরনের কাহিনি নিয়ে আগে কি হিন্দি সিনেমা তৈরি হয়নি? একটা নয়, একাধিক ছবি তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেইসব ছবিতে কোনও মুসলমানকে ছবির কেন্দ্রে রাখা হয়নি। আজকাল বেশ কিছু চলচ্চিত্র পরিচালক ও সমালোচক পাকিস্তান আফগানিস্তানের মতো দেশে বাজার তৈরি করার জন্য ভারতে মুসলমান ও ইসলাম বিপন্ন বলে জিগির তুলছেন। আর, মুসলমানদের নিয়ে ছবি বানিয়ে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছেন। গাল্লি বয়ের সেরা হওয়ার পিছনে এই ছক রয়েছে বলে মনে করছেন অনেক ক্রিটিক। ছবিটি দেখার সুবাদে ফিল্মফেয়ার কর্তৃপক্ষকে একটা কথাই জানাতে চাই, দয়া করে পুরস্কার বিক্রি করবেন না। এতে প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হয়।

—আদিত্য বসাক,
তাজপুর, হাওড়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

অযোধ্যার মন্দির হোক কৌশল্যা-সুখবন্ধন রামলল্লার



গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

সদ্য বিগত ২০১৯ সালটি নানা দিক দিয়ে ভারতের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে রইল। এই বছরে তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা আইনবিরুদ্ধ ঘোষিত হওয়ায় বিবাহিতা মুসলমান মহিলারা এক দীর্ঘকালীন বিরাট মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এই বছরেই জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল হয়ে যাওয়ায় কাশ্মীরের ভূমিপুত্র প্রায় চার লক্ষ পণ্ডিত তিরিশ বছরের উদ্বাস্তু জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে আবার নিজেদের বাসভূমে ফিরে যাবার সম্ভাবনার পথ পেয়েছেন। এই বছরেই নিজ মন্দির থেকে উৎখাত হয়ে প্রায় পাঁচশো বছরের উদ্বাস্তু অবস্থা থেকে অযোধ্যার রামলল্লা পুনরায় নিজক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সনদ লাভ করেছেন। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যার বহু বিতর্কিত মন্দির-মসজিদ সৌধ স্থলে রামলল্লার মন্দিরই প্রতিষ্ঠা করার রায় দিয়েছে। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার অন্তে, নানা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ সাপেক্ষে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে বাবরের নামাঙ্কিত মসজিদটি একদা রামের জন্মভূমির ওপর তৈরি মন্দির ধ্বংস করেই গড়ে উঠেছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে এই বিশাল দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা এই রায় পুনর্বিবেচনার আর্জির মধ্যে দেশের চল্লিশজন প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীর আবেদনটিও ছিল। বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ যাঁরা জীবিকা নির্বাহ করার জন্য নিজেদের বুদ্ধিকে আশ্রয় করেন, যা সমস্ত প্রাণীই করে থাকে। মানুষ কার্যোদ্ধারের জন্য যে বুদ্ধি প্রয়োগ করে তা সুবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি, কূটবুদ্ধি, দুষ্টবুদ্ধি—সবই হতে পারে। তাই সেইসব বুদ্ধিজীবীদের গ্রাহ্য না করাই ভালো। কথায় বলে 'লড়েকা সঙ্গ সরিকা নহী'। অর্থাৎ বালকের (লড়েকা) সঙ্গে শরিকানি (সরিকা) করতে নেই। তবু বালক রামের সঙ্গে, অযোধ্যার রামলল্লার সঙ্গে পাঁচশো বছর ধরে চলা শরিকানার এই দ্বন্দ নিষ্পত্তি



অযোধ্যার মন্দির ট্রাস্টের প্রথম বৈঠকে উপস্থিত সদস্যরা।

হওয়ায় কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ছাড়া এই বিশাল ভারতের সবাই আনন্দিত হয়েছেন। আযোধ্যায় রামলল্লার মন্দির সুস্বাগতম্।

'সারে জহাঁ সে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা' গানটির রচয়িতা মুহম্মদ ইকবালকে আমরা পাকিস্তানের প্রবক্তা হিসাবেও জানি। তাঁর মতে শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন 'ইমাম-ই-হিন্দ' অর্থাৎ ভারতের নেতা বা পরিচালক। সেই ইমাম-ই-হিন্দ আজ তাঁর নিজের জন্মস্থলে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন। সে কাজের জন্য এক দলিত পরিবারের ব্যক্তিকে শীর্ষে রেখে পনেরো সদস্যের ট্রাস্ট তৈরি হয়ে গেছে। এবার কাজ আরম্ভ করলেই হয়। বলা হয় 'শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্'। এই শুভকাজ অবিলম্বে আরম্ভ হোক্ এই কামনা করি। ভুলে গেলে চলবে না 'ছায়ী হুই হ্যায় গম কী ঘটায়েঁ চহার সু'—চারদিকে ছেয়ে আছে দুঃখ-ঈর্ষা-চিন্তার মেঘ।

শ্রীরামচন্দ্রকে যেমন ইমাম ই হিন্দ বলা হয়েছে তেমন তাঁকে মর্যাদা পুরুষোত্তমও বলা হয়। সীতাকে বনবাসে পাঠানোর জন্য অনেকে বিশেষ করে এই বঙ্গভূমে, রামের সমালোচনাও করেন। শ্রীরামকে বুঝতে হলে একটু তলিয়ে ভাবতেই হবে। তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি অযোধ্যাবাসীর হিতৈষী পালনকর্তা, লোকাভিরাম, রঘুকুলতিলক। তিনি সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজা। প্রজারা সর্বক্ষেত্রে রাজাকে অনুসরণ করে। প্রজারা জানত রাবণ সীতাকে হরণ করে দশমাস বন্দিনী করে রেখেছিল এবং শ্রীরাম রাবণকে পরাজিত করে সীতাকে উদ্ধার করেন। তারা জানত না রাবণের কাছে বন্দিনী হয়েও সীতা কীভাবে কায়মনোবাক্যে নিজের পবিত্রতা বজায় রেখেছিলেন। লঙ্কায় দেবতাদের সামনে সীতা অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজের নিষ্কলুষতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। সেকথা প্রজারা জানত না। কবি কৃত্তিবাস সেকথা স্পষ্ট লিখেছেন, 'প্রথম পরীক্ষা দিলে সাগরের পার/দেবগণ জানে তা না জানে সংসার।' তাই সীতাকে অযোধ্যায় এনে মর্যাদার সঙ্গে সংসারে স্থান দেওয়ায় প্রজারা সমালোচনা আরম্ভ করে। পাছে সামাজিক স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত হয় তাই শ্রীরাম নিজের সংসারসুখ বিসর্জন দিয়ে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমে নির্বাসিত করেন। তিনি জানতেন



সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মন্দির নির্মাণ ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পতলাল।

সীতা নির্দোষ। সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে শ্রীরাম নিজেকেও সকল বিলাস-বৈভব থেকে বঞ্চিত করে কেবল একজন সেবক হিসেবে নিয়োজিত রাখনে। এক পত্নীব্রত রামকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের জন্য চাপ দিলেও তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ না করে স্বর্ণসীতা নির্মাণ করে স্ত্রীর বিকল্পের ব্যবস্থা করেন। যজ্ঞের সময়েও স্বর্ণসীতাই তাঁর স্ত্রীর বিকল্প হয়েছে। এমন স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ এবং একপত্নীব্রত স্বামী যদি মর্যাদা পুরুষোত্তম না হন, যদি ইমাম্-ই-হিন্দ না হন তবে আর কে হবে!

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রয়োজনে মসজিদ স্থানান্তরিত করার শতাধিক উদাহরণ আছে। ইসলামের উৎপত্তিস্থল সৌদি আরবেই হজরত মুহম্মদ, আবু বকর ও উমরের সমাধি যে অন্ নবা ই মসজিদে আছে তারই এক বিরাট অংশ সরকার অধিগ্রহণ করে সেখানে হজ যাত্রীদের জন্য এক বিশাল অতিথিশালা নির্মাণ করেছে। বৃহত্তর জনস্বার্থে মসজিদের স্থানান্তরণ পাকিস্তানেও অনেক হয়েছে। শ্রীনগরে ঝিলম নদীর ওপর দ্বিমুখী যান চলাচলের উপযুক্ত একটি সেতু তৈরি করার জন্য রামপুরা অঞ্চলের মসজিদ আবু তুরাবকে ভেঙে দিয়ে স্থানান্তরিত করার কাজ চলছে।

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে এগিয়ে এসেছেন সকল ভারতবাসী। উত্তরপ্রদেশের শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ওয়াসিম রিজভি জানিয়েছেন অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে তাঁর বোর্ডের সম্মতি তো আছেই, সেই সঙ্গে তিনি তাঁর নিজস্ব সংস্থার তরফে এজন্য ৫১ হাজার টাকা দান করবেন। তাঁর কথায় ''ভগবান রাম মুসলমান সহ সবারই পূর্বপুরুষ, তাঁর মন্দির নির্মাণে সবারই এগিয়ে আসা উচিত'', এমন অনাবিল সত্য কথা বলার ক্ষমতা বেশি লোকের থাকে না, কারণ সহজ কথা সহজভাবে বলতে পারা মোটেই সহজ নয়। সংবাদে পাই, নবনির্মিত মন্দিরে যে বিশালাকার ঘণ্টাটি স্থাপিত হবে, যার ধ্বনি দূরদূরান্ত নিনাদিত করবে, সেটি তৈরি করছে ইকবাল নামের এক মুসলমান কারিগর। ঘণ্টাটিকে দৃষ্টিনন্দন করার জন্য পরমযত্নে দিনরাত এক করে সে খেটে চলেছে।

নানা জায়গায় পুত্রকে মায়েরা নানাভাবে সম্বোধন করেন। বাঙ্গালি মায়েরা সম্বোধনে যেমন খোকন, বাবু তেমনই লাল, লালু, লাল্টু। একবার ঢাকায় আমার ননদস্থানীয় দিলশাদের বাড়িতে শুনি তার মা নিজের জামাইকে খোকন বলে ডাকছেন। দিলশাদ তাঁর একমাত্র কন্যা, তাঁর কোনো পুত্র ছিল না। দিলশাদ বলে তার মা তাঁর জামাইকে খোকন বলে ডাকতেই ভালবাসেন। আমার অনভ্যস্ত কানে সেই ডাক চোখের ওপর থেকে এক পর্দা সরিয়ে দিয়েছিল। বুঝেঝিলাম বাঙ্গালি মায়ের প্রাণের থেকে উৎসারিত সেই ডাকের কোনোও জাতি-ধর্মের গণ্ডী নেই। এই প্রসঙ্গে স্যার ভি.এস. নইপলের একটি লেখা মনে পড়ছে সেখানে তিনি বলেছেন ভারত ছেড়ে দীর্ঘকাল বিদেশে থাকায় তাঁর পূর্বপুরুষরা দেশের অনেক কিছুই বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মায়েদের মুখের বেটা সম্বোধনটি রয়ে গেছে। পুত্রকে বেটা সম্বোধনের মধ্য দিয়ে যেমন তাঁরা মায়ের স্নেহের স্পর্শ পেতেন তেমনই পেতেন শতাধিক বর্ষ আগে ছেড়ে যাওয়া পিতৃভূমির পরশ।

পশ্চিম ভারতে বালক পুত্রকে মায়েরা লাল, লল্লা, লল্লন, ললন ইত্যাদি স্নেহের সম্বোধন করে ডাকেন। অযোধ্যায় রামের যে মন্দির গড়ে উঠবে তা প্রজাবৎসল অযোধ্যা নরেশ 'রঘুপতি রাঘব রাজা' রামের নয়। সে মন্দির ভয়হরমঙ্গল, পতিতপাবন রামেরও নয়, বা 'ইমান ই হিন্দ' রামেরও নয়। সেই মন্দির যেন হয় শুধুমাত্র আনন্দামৃতবর্ষক 'দশরথনন্দনের বা কৌশল্যা সুখ-বন্ধন' রামলল্লার। ▮

বিরিয়ানির গন্ধে রাহুলের একাদশীভঙ্গ

সন্দীপ চক্রবর্তী

বিরিয়ানির গন্ধ নাকে এসে লাগলে আর রক্ষে নেই! কেউ কেউ একাদশী ভঙ্গ করে দৌড়ে এসে হেঁশেলে ঢুকে পড়েন। বিরিয়ানি কথাটি এখানে রূপক। আসল কথাটি হলো জল যথেষ্ট ঘোলা হয়েছে দেখে রাহুল গান্ধী মওকা বুঝে মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন।

ঊনিশের লোকসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবির পর কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পদে সোনিয়া গান্ধী ফিরে এসেছিলেন। রাহুল গান্ধী চলে গিয়েছিলেন অন্তরালে। বলা যেতে পারে, দল তার মতো পরাজিত সেনাপতিকে জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু গান্ধীপরিবারের উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতার মোহ থেকে বা দিল্লির তখতে বসার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা থেকে কতদিনই বা দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব! তাই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত হবার পর দেশের কয়েকটি জায়গায় এই আইনের বিরোধিতার নামে নাটক শুরু হওয়া মাত্র তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর প্রতি কংগ্রেসের নীচুতলার কর্মীদের রোষ উপেক্ষা করে ফিরে এসেই তিনি টুইটারের মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে তিনটি প্রশ্ন করেছেন। বলা বাহুল্য, রাহুলের প্রশ্নগুলি গত বছর পুলওয়ামায় জঙ্গি-আক্রমণে নিহত সিআরপিএফের ৪০ জন জওয়ানকে নিয়ে। এ বছর সারা দেশের মানুষ যথার্থ শ্রদ্ধায় এবং সম্মানে পুলওয়ামা কাণ্ডের বর্ষপূর্তি পালন করেছেন। স্মরণ ও মননের মাধ্যমে বীর জওয়ানদের প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আবালবৃদ্ধবণিতা। মোদী সরকারের কাছে তিনি জানতে চেয়েছেন, (১) পুলওয়ামার ঘটনায় কে সব থেকে বেশি ফয়দা লুটেছে? (২) পুলওয়ামা কাণ্ডের যে তদন্ত এন আই এ করছে তা থেকে কী জানা গেছে? (৩) পুলওয়ামার হত্যাকাণ্ড ভারতীয় গোয়েন্দাদের ব্যর্থতার চরম উদাহরণ। এর জন্য মোদী সরকারের কোন কোন মন্ত্রী দায়ী?

টুইটটি ভালো করে পড়লে বোঝা যায়



আদিল আহমেদ দার।

গতবছর ১৪ ফেব্রুয়ারি পুলওয়ামায় সেনা কনভয়ে হামলা চালায় জইশ-ই-মহম্মদের জঙ্গিরা। প্রায় ২৫০০ সেনা বাসে করে যাচ্ছিলেন। এই সময় বিস্ফোরক-ভর্তি একটি গাড়ি কনভয়ে ধাক্কা মারে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলেই ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান মারা যায়। এই হামলার নেতৃত্বে ছিল আদিল আহমেদ দার।



পুলওয়ামার শহিদদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। (ফাইলচিত্র)



পুলওয়ামার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

রাহুলের লক্ষ্য এক এবং একমাত্র নরেন্দ্র মোদী। লোকসভা নির্বাচনের বহু আগে থাকতেই তিনি নরেন্দ্র মোদীকে চাঁদমারি বানিয়ে একের পর এক গোলাগুলি নিক্ষেপ করে আসছেন। রাফাল-ডিলে নরেন্দ্র মোদী দুর্নীতি করেছেন, এই অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রীকে চোর বলতেও ছাড়েননি। প্রধানমন্ত্রী নিজেকে দেশের চৌকিদার বললে রাহুল 'চৌকিদার চোর হ্যায়' বলে তাকে কটাক্ষ করেছেন। মানুষের ভোটে নির্বাচিত দেশের প্রশাসনিক প্রধানকে কোনও প্রমাণ ছাড়াই চোর বলার সমুচিত প্রতিফল তিনি পেয়েছেন কিন্তু শিক্ষা নেননি। এবারও তার লক্ষ্য নরেন্দ্র মোদী। এবারও তার উদ্দেশ্য প্রধামন্ত্রীকে অপমান করা।

রাহুল গান্ধীর লক্ষ্য যে নরেন্দ্র মোদী সেটি তার প্রশ্নগুলি পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। প্রথম প্রশ্নে তিনি জানতে চেয়েছেন, পুলওয়ামা কাণ্ডে সব থেকে বেশি কে উপকৃত হয়েছেন? পুলওয়ামায় জঙ্গির হামলা করেছিল ঊনিশের ফেব্রুয়ারিতে। আর ওই বছরেরই মে মাসে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই নির্বাচনে জিতে নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হন। অর্থাৎ রাহুল গান্ধী এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে পুলওয়ামা কাণ্ডে সব থেকে বেশি উপকৃত হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু শুধু এইটুকু বোঝানোই কি রাহুলের উদ্দেশ্য ছিল? অবশ্যই না। বিশেষ করে পুলওয়ামা কাণ্ডে পাকিস্তান-যোগ প্রসঙ্গে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান যে বিবৃতি দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে রাহুলের উদ্দেশ্য ছিল আরও সুদূরপ্রসারী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের প্রাক্কালে ইমরান পুলওয়ামা কাণ্ডে পাকিস্তান-যোগ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'এই হামলা সম্পূর্ণতই কাশ্মীরের মাটি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে পুলওয়ামা হামলার দাবিদার জইশ-ই-মহম্মদ মূলত পাকিস্তান কেন্দ্রিক সংগঠন হলেও তারা কাশ্মীরেও যথেষ্ট সক্রিয়। হামলার প্রধান পাণ্ডা আদিল আহমেদ দার নিজেও কাশ্মীরের লোক। ইমরান দাবি করেছিলেন, ভারতীয় সেনার অত্যাচারের ফলেই নাকি দার সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। সব মিলিয়ে ইমরানের বক্তব্য ছিল, পুলওয়ামা হামলার ছক কষা হয়েছিল ভারতের মাটিতে এবং তার পিছনে ছিল কোনো বড়ো মাথা। রাহুল গান্ধীর প্রথম প্রশ্নের আড়ালেও রয়ে গেছে সেই বড়ো মাথার প্রসঙ্গটি। ভোটে জিতে যদি নরেন্দ্র মোদী সব থেকে উপকৃত হন তাহলে তিনিই সেই বড়ো মাথা— যিনি ভোটে জেতার জন্য চল্লিশ জন জওয়ানকে খুন করিয়েছিলেন। এই ধরনের একজন মানুষকে পাপ্পু-টাপ্পু বলে যারা আত্মপ্রসন্ন হতে চান, হোন কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, রাহুল গান্ধী মোটেই পাপ্পু নন। তিনি এবং তাঁর দলটি ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে পাকিস্তান লবির ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন। সেই ভারতবিরোধী রাজনীতির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে রাহুলের এবং কংগ্রেসের রাজনীতিতে।

দ্বিতীয় প্রশ্নে রাহুল জানতে চেয়েছেন পুলওয়ামা কাণ্ডের তদন্তের কী হলো? প্রশ্নটি বিভ্রান্তিমূলক। কারণ যে তদন্ত এখনও শেষ হয়নি তার ফলাফল কীভাবে জানানো যেতে পারে। এটা বোধহয় লোকসভা নির্বাচনোত্তর দীর্ঘ একাদশী পালনের সাইড এফেক্ট। যাই হোক, তৃতীয় প্রশ্নে রাহুল জানতে চেয়েছেন, পুলওয়ামা কাণ্ডের জন্য দায়ী যে গোয়েন্দা ব্যর্থতা তার জন্য বিজেপির কোন কোন মন্ত্রী দায়ী? এই প্রশ্নটি করেছেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য মহম্মদ সেলিমও। তার অভিমত, পুলওয়ামায় নিহত জওয়ানদের জন্য কোনও স্মারক নির্মাণের প্রয়োজন নেই। কারণ এই স্মারক নাকি গোয়েন্দা



পুলওয়ামার শহিদের কফিন কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ।

ব্যর্থতার কথাই তুলে ধরে।

মহম্মদ সেলিম কোনো নতুন কথা বলছেন না। মনে রাখতে হবে, পুলওয়ামা কাণ্ডের অব্যবহিত পর থেকেই বামপন্থী শিবির থেকে গোয়েন্দা ব্যর্থতার কথাটি ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় কথা চালাচালি বন্ধ হয়নি। এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় পুলওয়ামা কাণ্ডে পাকিস্তানের ওপর বাড়তে থাকা আন্তর্জাতিক চাপ কমাতে সাহায্য করা। এবং অবশ্যই ভারতীয় মুসলমানদের এই বার্তা দেওয়া যে এ দেশের বামপন্থীরা পাকিস্তানের পাশে আছে। কিন্তু এসব করে কোনও লাভ হয়নি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান চীন ও কয়েকটি ইসলামিক দেশ ছাড়া কাউকে পাশে পায়নি। আমেরিকা স্পষ্টতই পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দিয়ে বলেছে, গত পনেরো বছর ধরে পাকিস্তান ক্রমাগত তাদের মিথ্যে কথা বলে এসেছে। পুলওয়ামা কাণ্ডে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মুখ পোড়ার পিছনে দায়ী মূলত দুটি ঘটনা, (১) ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে আমন্ত্রণ, এবং (২) শরিফের ভাগ্নীর বিয়েতে নরেন্দ্র মোদীর নিমন্ত্রণ রক্ষা। এই দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে মোদী সারা বিশ্বকে বার্তা দিয়েছিলেন যে ভারত পাকিস্তানের শত্রু নয়। ফলে পাঠানকোট এবং পুলওয়ামা হামলার পর সারা বিশ্বে পাকিস্তান-বিরোধী জনমত গড়ে তুলতে নরেন্দ্র মোদীকে বিশেষ কাঠখড় পোড়াতে হয়নি।

> “তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী শিবিরের মধ্যে রাজযোটক মিল। দু’পক্ষই সুযোগ পেলে হিন্দুর গোরু চুরি করে। তারপর সন্ধ্যেবেলায় সেজেগুজে হাজির হয় মুসলমানের দেওয়া দাওয়াতে।”

কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা সম্ভব, দেশীয় ক্ষেত্রে তা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? আর সম্ভব হলেই বা শুনছে কে! বিশেষ করে শাহিনবাগে যেখানে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে এবং প্রতিবাদ-চত্বরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন বোরখা-পরা মুসলমান মহিলারা। সুতরাং এটাই পুলওয়ামা কাণ্ডে পাকিস্তানকে ক্লিনচিট দেবার উপযুক্ত সময়। এর ফলে তিন তালাক বিরোধী আইন পাশ করার জন্য মুসলমান মহিলামহলে মোদীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং দিল্লির নির্বাচনে যার লাভ ঘরে তুলবে কংগ্রেস। নির্বাচনে কী ফল হয়েছে সবাই জানেন। ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে কংগ্রেস।

প্রশ্ন হলো, এই লজ্জাজনক হার থেকে কি রাহুল এবং তার দল শিক্ষা নেবেন? না, নেবেন না। নিলে ভারতের স্বাধীনোত্তর ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তাভাবনা এবং মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া কংগ্রেসের চরিত্র নয়। সুতরাং রাহুল তার প্রপিতামহের মতোই ভারতে ইসলামিক সন্ত্রাসের শিকড়টিকে সযত্নে আড়াল করবেন। পাকিস্তানকে বারবার ক্লিনচিট দেবেন। এবং এইসব করে তিনি তার বাবা, পিতামহী এবং প্রপিতামহের মতো জিইয়ে রাখবেন সমস্যাটিকে। যাতে খুড়োর কল সামনে রেখে ভোটের রাজনীতি করা যায়। এই কাজে তাদের দোসর বামপন্থীরা। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী শিবিরের মধ্যে রাজযোটক মিল। দু’পক্ষই সুযোগ পেলে হিন্দুর গোরু চুরি করে। তারপর সন্ধ্যেবেলায় সেজেগুজে হাজির হয় মুসলমানের দেওয়া দাওয়াতে।

পুলওয়ামার হামলা কি ভারতের পাকপ্রেমীদের উজ্জীবিত করতে?

সাধন কুমার পাল

গত বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের ইতিহাসের এক কালো দিন। এই দিনেই কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সেনা কনভয়ে জঙ্গি হামলা ঘটে। বীরগতি প্রাপ্ত হন ৪০ জন সেনা। এই হামলার দায়ভার স্বীকার করে নিয়েছে পাকিস্তান-ভিত্তিক ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ। হামলাকারী জইশ-ই-মহম্মদের সদস্য আদিল আহমদ দার। সেনাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এই অভিযোগ তুলে সমালেচনার ঝড় তোলে কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধীদল। এই ঘটনার বদলা হিসেবে পাকিস্তানের বালাকোটে এয়ারস্ট্রাইক চালায় ভারতীয় সেনা। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে ভারতীয় বিমানবাহিনীর ১২টি মিরাজ-২০০০ জেট বিমান নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে বালাকোটে জইশ-ই-মহম্মদ পরিচালিত একটি জঙ্গি ঘাঁটিতে আঘাত করে। বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে খবর আসে যে এই অপারেশনে ২০০ থেকে ৩০০ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। এদিকে নিজেদের দুর্বলতা গোপন করার লক্ষ্য নিয়ে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এই হামলার কথা অস্বীকার করা হলেও পরবর্তী সময় বলা হয় যে হামলা হয়েছে ঠিকই তবে সেটা ফাঁকা জায়গায়, এতে কয়েকটি গাছ উপড়েছে মাত্র।

ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়া বিরোধীদের কাছে পাকিস্তানের এই বক্তব্য ছিল সঞ্জীবনীসুধার মতো। ক্ষমতার রাজনীতিতে নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তুলতে বিরোধীরা পাকিস্তানের সুরে সুর মিলিয়ে ভারত সরকার ও ভারতীয় সেনার কাছে হামলার প্রমাণ চাইতে শুরু করলেন। ভারতের বিরোধীদলের নেতারা নিজের দেশের সেনার পরাক্রম নিয়ে প্রশ্ন তোলায় দেশের ভিতরে-বাইরে পাকিস্তান সরকার ও সেনা উভয়েরই মুখ রক্ষা হলো। আরও একবার প্রমাণ হলো ক্ষমতার রাজনীতির স্বার্থে বিরোধীরা প্রয়োজনে দেশের শত্রুদের হাত ধরতেও কুণ্ঠাবোধ করবেন না। এই ঘটনার পর অনুষ্ঠিত উনিশের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য দেশের শত্রুদের পাশের দাঁড়ানোর বিষয়টি ভারতের ভোটদাতারা ভালোভাবে নেয়নি।

পুলওয়ামা হানার এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যখন সমস্ত দেশ বিনম্র চিত্তে শহিদদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণে ব্যস্ত তখন রাহুল গান্ধীর একটি টুইটকে বাজনদার মিডিয়া আবার শিরোনামে তুলে আনার প্রয়াস করল। তিনটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন প্রাক্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট রাহুল গান্ধী। কোনো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বা পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করে নয়, সবকটি প্রশ্নই ভারতীয় সেনা প্রতিক্রিয়ায় রাহুলকে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে অভিযোগ করেছে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র জিভিএল রাও।

জওয়ানদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানোর পর তিনটি প্রশ্ন করলেন রাহুল। তাঁর প্রশ্ন, এই হানা থেকে সবচেয়ে লাভ করল কে? পুলওয়ামা হানার তদন্তের ফলাফল কী হলো? নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ফাঁকফোকরের জন্য যে আক্রমণ হলো তার জন্য বিজেপি সরকার কি দায়িত্ব নেবে, সেই প্রশ্নও তোলেন রাহুল। এরপরেই জিভিএল রাও বলেন— When nation is paying homage to martyrs of dastardly Pulwama attack, @RahulGandhi, a known sympathizer of LeT & Jaish-e-Mohammad, chooses to target not



forces as well. Rahul wil never question real culprit Pakistan. Shame on you Rahul ! জিভিএলের কথায়, 'দেশ যখন শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছে, তখন রাহুল গান্ধী শুধু সরকার নয়, নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন। এটা সবাই জানে যে রাহুল গান্ধী লস্কর ও জইশের প্রতি সহানুভূতিশীল। আসল দোষী পাকিস্তানকে কখনো রাহুল প্রশ্ন করবেন না। ধিক্কার রাহুলকে!' শুধু রাহুল গান্ধী নন দেশের কমিউনিস্ট কুলাঙ্গাররাও পাকিস্তানের সুরে সুর মিলিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। যেমন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম বলেছেন, পুলওয়ামার ঘটনা স্মরণ করা নাকি লজ্জার এবং শহিদের স্মৃতিতে কোনো স্মারক তৈরির প্রয়োজন নেই। চীনের সেনাবাহিনীকে মুক্তির দূত মনে করা কমিউনিস্টরা ভারতীয় সেনার জন্য স্মারক তৈরিতে আপত্তি জানাবে এতে আর অবাক হওয়া কী আছে! তবে প্রশ্ন অন্যত্র।

পুলওয়ামা হানার কয়েকদিনের মধ্যে এই হামলার বিস্তারিত তথ্য জনসমক্ষে এসে গিয়েছে। ভারতীয় সেনা মাসুদ আজাহার ছাড়া এই হামলার সঙ্গে যুক্ত প্রায় সমস্ত সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করে দিয়েছে। ষড়যন্ত্রী পাকিস্তান উপযুক্ত জবাব পেয়েছে। একমাত্র চীনের বাধার জন্য ভারত মাসুদ আজাহারকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেনি। এই সমস্ত খবর সমগ্র বিশ্ব জানে।



রাহুল গান্ধী জানবেন না এটা হয় না। প্রশ্ন হচ্ছে, সব জেনেও রাহুল গান্ধী এই ধরনের প্রশ্ন করছেন কেন? এর সঠিক উত্তর রাহুল গান্ধীই দিতে পারবেন। তবে পুলওয়ামা হানার এক বছর পর রহুল গান্ধী যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন তাতে পাকিস্তান নৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে নতুন করে ভারতের বিরুদ্ধে বিশ্বমঞ্চে লড়াই করার অস্ত্র পাবে। এই লড়াইয়ে ভারত যদি কোনো ভাবে ব্যাকফুটে চলে যায় তাহলে নরেন্দ্র মোদীকে কাঠগড়ায় তুলে রাহুল গান্ধীরা নতুন ইস্যু পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারবে। শুধু পুলওয়ামা নয়, আরও বিভিন্ন ইস্যু ধরে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রাহুল গান্ধী, মমতা ব্যানার্জিদের মতো রাজনীতিবিদদের কাছে দেশের সম্মান ও স্বার্থের চেয়ে নিজেদের ক্ষমতায় ফেরা বা ক্ষমতা ধরে রাখা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

পুলওয়ামার ঘটনার সেনাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এই অভিযোগ তুলে সমালোচনার ঝড় তুলে কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী দল বিভিন্ন সময় বাজার গরম করার অপপ্রয়াস করে গেছে। আমরা সাধারণ ভাবে তো এটাই জানি যে কেন্দ্রীয় সরকার পুলিশ বা আধসেনা পাঠিয়ে সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে না। সেনাবাহিনী নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিজেরাই করে থাকে। সেনা স্থানান্তরণ বায়ুপথে হবে না স্থলপথে হবে সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক তো সেনাবাহিনীই। বড়োমাপের সেনা কর্তাদের কাছেও এই ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। তাঁদেরও স্পষ্ট বক্তব্য যে, সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করা মানে সেনাবাহিনীকেই অপমান করা।

পুলওয়ামার ঘটনার জেরে কারা লাভবান হয়েছিল এই প্রশ্নের জবাবের আগে রাহুল গান্ধীকে



২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ভারতীয় সেনার কনভয়ে পাকিস্তানি জঙ্গিদের হামলার ঠিক ১২ দিন পরে, ২৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের বালাকোট জইশ-ই-মহম্মদের জঙ্গি ঘাঁটিতে আঘাত হানে ভারতীয় বায়ু সেনা। ১২টি মিরাজ ২০০০ যুদ্ধ বিমান নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে এই জঙ্গি ঘাঁটিতে আঘাত হেনে নিরাপদেই ফিরে আসেন ভারতীয় বায়ুসেনার ঘাঁটিতে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর এই হানায় প্রায় ৩০০ জন পাকিস্তানি জঙ্গি নিহত হয়েছিল। পাকিস্তান প্রথমে এই হামলার কথা স্বীকার না করলেও পরবর্তীকালে হামলার ঘটনা স্বীকার করে নেয়। আশ্চর্যের বিষয় যে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও এই হামলা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে ভারতীয় বায়ু সেনার কৃতিত্বকে খাটো করতে চেয়েছিলেন।



পুলওয়ামার শহীদের শেষযাত্রায় কান্নায় ভেঙে পড়লেন পরিজনরা।

অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। যেমন বিজেপি নেত্রী মীনাক্ষী লেখি প্রশ্ন তুলেছেন ইন্দিরা গান্ধী কিংবা রাজীব গান্ধীর মৃত্যুতে কারা লাভবান হয়েছিল? সেনা কনভয়ে এই হানা প্রথম নয়, এর আগের অনেকবার এমন ঘটনা ঘটেছে। তথ্য বলছে জম্মু-কাশ্মীরে এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার নিরাপত্তা রক্ষীর মৃত্যু হয়েছে। কিছু বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

২৪ জুন ২০১৩ : শ্রীনগরের হায়দারপোরায় একটি সেনা বাসে হামলা চালায় জঙ্গিরা। সেসময় জওয়ানদের কাছে কোনও অস্ত্র ছিল না। ঘটনায় প্রাণ হারান আট সেনা।

১৯ জুলাই ২০০৮ : নার্বালের কাছে শ্রীনগর-বারামুলা হাইওয়েতেই আইইডি বিস্ফোরণে নিহত হন দশজন সেনা।

২০ জুলাই ২০০৫ : সেনাদের কনভয় লক্ষ্য করে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় এক আত্মঘাতী জঙ্গি। নিহত হন তিন জওয়ান এবং দুই সাধারণ নাগরিক।

৪ আগস্ট ২০০৪ : শ্রীনগর-মুজাফ্ফরার রাস্তা খোলার দাবিতে উরিতে পিডিপি মিছিলে গ্রেনেড হামলায় ১১ জনের মৃত্যু হয়।

২২ জুলাই ২০০৩ : আখনুরে এক ব্রিগেডিয়ার-সহ আটজন সেনা নিহত হন জঙ্গি হানায়। বহু আধিকারিক গুরুতর জখম হয়েছিলেন।

২৮ জুন ২০০৩ : সুজওয়ান সেনা ঘাঁটিতে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হন এক আধিকারিক-সহ ১২ জন সেনা। দুই জঙ্গিকে খতম করতে সফল হন জওয়ানরা।

১৪ মে ২০০২ : জম্মু কালুচক সেনা ক্যান্টনমেন্টে তিন জঙ্গির হামলায় ৩৬ জন জওয়ান শহিদ হয়েছিলেন। পরে তিন জঙ্গিকেই শেষ করে সেনা।

১ অক্টোবর ২০০১ : শ্রীনগরে বিধানসভা ভবনের কাছে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে ৩৮ জন সেনা প্রণ হারান। পালটা লড়াইয়ে শেষ হয় তিন জঙ্গি।

১০ আগস্ট ২০০০ : শ্রীনগরের রেসিডেন্সি রোডে গ্রেনেড হামলার ছক কষে জঙ্গিরা। খবর পেয়ে সেখানে সেনারা হাজির হতেই একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় জঙ্গিরা। যাতে প্রাণ হারান ১১ জন। মৃত্যু হয় এক চিত্রসাংবাদিকের। কংগ্রেস জামানায় এরকম প্রচুর ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। রাহুল গান্ধী দয়া করে বলবেন এই বিপুল পরিমাণ মৃত্যুতে কারা লাভবান হয়েছিলেন?

বেশ কয়েক বছর ধরে কংগ্রেসের গবেষণাগারে একটা ধারণা তৈরি করা হয়েছে, দেশের মুসলমান, খ্রিস্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে 'হিন্দু সন্ত্রাস'। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন এই ধারণাটির একটি নামকরণও করা হয়েছিল— 'গেরুয়া সন্ত্রাস'। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল সংসদ ভবনে 'হিন্দু সন্ত্রাস' নিয়ে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমও গেরুয়া সন্ত্রাস নিয়ে সকলকে সাবধান করেছিলেন।

বলা হয়েছিল, সন্ত্রাসবাদের কোনও ধর্ম হয় না, কিন্তু নির্দিষ্ট রং হয়। রাহুল গান্ধীও এই বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। এক মার্কিন দূতকে তিনি বলেছিলেন, ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের থেকে ডানপন্থী সন্ত্রাসবাদ নাকি অনেক বেশি ভয়ংকর। সেই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে রাহুল গান্ধীর কথোপকথন উইকিলিকস প্রকাশ করে দিয়েছিল। প্রাক্তন মুম্বই কমিশনার রাকেশ মারিয়ার দাবি যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি কংগ্রেসের এই হিন্দু সন্ত্রাস তত্ত্ব প্রমাণের দায়িত্ব নিয়েছিল।

২০০৮ সালের মুম্বই আক্রমণের দায় হিন্দুদের ওপর চাপানোর পরিকল্পনা করেছিল লস্কর-ই-তৈবা। নিজের আত্মজীবনী 'Let Me Say It Now'-তে এই দবি করেছেন প্রাক্তন মুম্বই কমিশনার রাকেশ মারিয়া। মারিয়ার দাবি, লস্কর চেয়েছিল আজমল কাসভের মৃত্যুর পর তাকে লোকে চিনবে বেঙ্গালুরুর সমীর চৌধরী হিসেবে। মারিয়া লিখেছেন যে আজমল কাসভকে জেলে মারার অনেক চেষ্ট করেছিল পাকিস্তানের আইএসআই। এই জন্য দাউদ ইব্রাহিমের গ্যাংকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মারিয়ার দাবি, সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের প্ল্যানে সফল হলে কাসভ মারা গেলে তার নামের জায়গায় সবাই সমীর চৌধরীর নাম জানতে পারত। এর ফলে এই সন্ত্রাসবাদী হানার দায় হিন্দুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যেত। এর জন্য সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে ভুয়ো ভারতীয় আইডি কার্ড দিয়ে দিয়েছিল লস্কর। একবার কাসভের নাম সমীর চৌধরী হিসেবে সবাই জেনে গেলে মিডিয়া বলত যে হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা মুম্বই আক্রমণ করেছে। কিন্তু সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ।

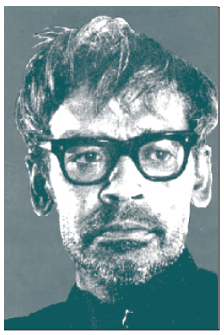
ঘটনাক্রম বলছে হিন্দু সন্ত্রাস তত্ত্ব একটি বড়ো ধরনের ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা। এই ষড়যন্ত্রের ফলিত রূপ প্রথম দেখা গিয়েছিল ২০০৬ সালে। ২০০৬ ও ২০০৭ সালে মালেগাঁও বিস্ফোরণ, মক্কা মসজিদ বোমা হামলা, সমঝোতা এক্সপ্রেস বোমা হামলা এবং আজমির শরিফ দরগাহ বিস্ফোরণের ঘটনায় সন্ত্রাসী হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করে কয়েকজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার (এখন সবাই বেকসুর খালাস) করা হয়। এরপর ২০০৮ সালে ২৬/১১ মুম্বই হামলার ঘটনায় কাসভকে হিন্দু সন্ত্রাসবাদী প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। স্পষ্টতই ২০০৬ সাল থেকে শুরু করে ২০০৮ সালে ২৬/১১ মুম্বই হামলার মাধ্যমে হিন্দু সন্ত্রাস তত্ত্ব চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার প্রয়াস হয়েছে। ■

দেশভাগ বিরোধী কাপালিক ঋত্বিক

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনে বাংলাদেশে অত্যাচারিত হিন্দু বাঙ্গালিদের ভারতে নাগরিকত্ব প্রদান নিয়ে অকালপ্রয়াত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটকের নাম খুব উঠে আসছে। চিরাচরিত বুদ্ধিজীবী মহল একে প্রত্যাশিতভাবেই মহান শিল্পীর প্রতি অবমাননা ইত্যাদি বলে ধিক্কার জানিয়েছেন। এই চলচ্চিত্রকারের ওপর তাদের এক ধরনের চিরস্থায়ী একাধিপত্য রয়েছে। অনেকটা পেটেন্ট নিয়ে নেওয়ার মতো। বাঙ্গলার সংস্কৃতি জগতে তা সাহিত্য, চলচ্চিত্র যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক মাঝে মাঝে এক ধরনের চিহ্নিতকরণ দেখা গেছে। তারাশঙ্কর রাঢ় বাঙ্গলার রূপকার, কয়লাখনির লেখক শৈলজানন্দ, নির্জনতার কবি জীবনানন্দ, তেমনি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নকশাল আন্দোলনের চিত্রকার মৃণাল সেন (ইন্টারভিউ, পদাতিক, কলকাতা ৭১) এমন অনেকেই বলেন। কিন্তু একটি মানুষের চলচ্চিত্র- জীবনের সবটাই যদি কারুর দেশবিভাগ ও তজ্জনিত মর্মবেদনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে থাকে তিনি ঋত্বিক ঘটক।

এই সূত্রে ভারতবর্ষের অন্যতম চলচ্চিত্র বোদ্ধা প্রয়াত আশিস রাজধ্যক্ষ তাঁর Ritwik Ghatak–A return to the Epic গ্রন্থে জানিয়েছেন ''The raw experience of the event (partition) particularly the overwhelming sense of loss on seeing his motherland suddenly turn politically alien was etched deeply in his emotions. ঋত্বিকের শৈশব কৈশোর কেটেছে যশোর, রাজশাহী ময়মনসিংহ প্রভৃতি তৎকালীন পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে। তিনি আদৌ কোনো নিম্নবিত্ত পরিবারের



সন্তান ছিলেন না— গৃহচ্যুতি হলেই যাকে সর্বস্বান্ত হতে হবে। তাঁর বাবা ছিলেন পরাধীন ভারতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (মতান্তরে হাকিম)। সেই সুবাদে তাঁরা যথেষ্ট সচ্ছল জীবনেই অভ্যস্ত ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র অত্যন্ত সংবেদনশীল ঋত্বিক উপলব্ধি করেছিলেন নিজ সংস্কৃতি, যোগসূত্র, ছিন্নমূল হওয়ার হতাশা ও আপামর বাঙ্গালি সমাজের ওপর এর (দেশভাগ) সুদূরপ্রসারী প্রভাব। তাঁর ভাইঝি মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন, ''দেশভাগ ও মানুষের মনোজগতের ঐতিহ্যহীনতা... তাঁর সুবর্ণরেখা নির্মাণ অবধি সবচেয়ে আধিপত্য বিস্তারকারী চিন্তা থেকেছে।'' কথাটি সত্য নিশ্চয়ই, তবে শ্রী ঘটকের চলচ্চিত্র জীবন পূর্বাপর পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে একমাত্র 'অযান্ত্রিক' ছাড়া তাঁর সব ছবিরই কেন্দ্রীয় চরিত্র দেশভাগের অভিঘাত।

মেঘে ঢাকা তারা ছবিতে আজ থেকে ৬০ বছর আগে উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকতে বাধ্য হওয়া শরণার্থী পরিবারটির একমাত্র উপার্জনকারী নীতা। বাংলা চলচ্চিত্রে সেই হয়তো প্রথম মেয়েদের রোজগেরে হওয়ার বাধ্যবাধকতা। উদ্বাস্তু জীবনের চরম অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার কাছে নীতার প্রেমের অপমৃত্যু ঘটে। নীতার বোন ও তার প্রেমিক কেজো নীতাকে এড়িয়ে নিজেরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। গোটা সংসার প্রতিপালনের ভার তার ওপর। যেখানে তার ধ্রুপদী সংগীত রেওয়াজ করা দাদাও দাড়ি কামাতে তার কাছে চার আনার জন্য হাত পাতে। ছেঁচা বেড়ার কাঁচা উঠোনের বাসা বাড়িতে মা গীতা দে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার জানিয়ে যান্ত্রিকভাবে রান্না করে যান। সংসারের রসদ জোগাতে ক্ষয়ে যেতে থাকে নীতা। ছবিটির ফ্রেমে ফ্রেমে জড়িয়ে আছে নিজ বাসভূমি থেকে উৎখাত হওয়ার জীবন যন্ত্রণা। মায়ের ধিক্কার তো দেশভাগকেই। 'দাদা আমি বাঁচতে চাই'য়ের শেষ দৃশ্য চলচ্চিত্রমোদীরা জানেন।

১৯৫৫-তে বম্বের ফিল্মিস্তান স্টুডিয়োর মাইনে করা সফল চিত্রনাট্যকার ছিলেন ঋত্বিক। বিমল রায়ের 'মধুমতী', হৃষিকেশ মুখার্জির 'মুসাফির' সে সময়কার অত্যন্ত জনপ্রিয় ছবির তিনিই ছিলেন চিত্রনাট্যকার। কিন্তু



দেশভাগের বিষ পান করেছিলেন তিনি। সব শেষ ছবি 'যুক্তি-তক্কো গপ্পো'তে আমরা দেখব তাঁর নিজের অভিনীত চরিত্রের নামও ইচ্ছাকৃতভাবে নীলকণ্ঠ। অত্যন্ত স্বল্পপরিচিত ছবি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তেও একটি অপাপবিদ্ধ গ্রাম্য কিশোরের চোখ দিয়ে দেখা সে সময়কার কলকাতা শহরে শুরু হওয়া অবক্ষয়ের মধ্যে (বিপুল উদ্বাস্তু আগমন অব্যাহত) পড়ে ছেলেটি সেই চিরকালীন ঘরে ফেরার আকুতি নিয়ে বলে 'বাড়ি সব চেয়ে ভালো'। 'ঋত্বিক আসলে তাঁর নিজের আশ্রয় হারানোর নিয়তিই ব্যক্ত করলেন। বাংলাদেশের রাজশাহী শহরে তাঁর যমজ বোন প্রতীতি দেবীর যেখানে বাড়ি (সম্প্রতি ৯৪ বছরে মারা গেলেন) ঋত্বিকের বাবা বিরাট পরিবার নিয়ে সেখানেই থাকতেন। সেই সময়কার ও পরে ময়মনসিংহের আশঙ্কাহীন নির্মল জীবনযাত্রার কথা ঋত্বিকের মনে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

তাঁর সবচেয়ে আবেগমথিত, টানটান ছবি 'সুবর্ণরেখা'— এই বাস্তুচ্যুতি চরিত্রগুলিকে কীভাবে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস করে দিচ্ছে তারই চিত্ররূপময়তায় ভরা। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, ঋত্বিক দেশভাগ নিয়ে নিখাদ তথ্যচিত্র কেন বানালেন না? কেন বানাবেন? তিনি তো স্রষ্টা। সত্যজিতের সংজ্ঞায় 'the cinema is basically the expression of a concept in aesthetic terms' —ঋত্বিকের আটটির মধ্যে ছটি ছবিতেই এই দেশভাগজনিত অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ ও নান্দনিক বিচ্ছুরণ সমান্তরালভাবে চলেছে। সুবর্ণরেখার চরিত্রের নামগুলি মনে রাখবেন। ঈশ্বর, সীতা, অভিরাম, হরপ্রসাদ। পাকিস্তান- বিতাড়িত এই মানুষগুলি পশ্চিমবঙ্গ নামক বিদেশে এসে উপর্যুপরি কী চূড়ান্ত ভাগ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিস্থিতির ভয়াবহ অনিবার্যতায় মুখ্য চরিত্র ঈশ্বর আত্মহত্যাপরায়ণ। বন্ধু হরপ্রসাদ তাকে কলকাতার মজা আস্বাদনে নিয়ে যায়। ঋত্বিককে melodrama নির্ভর পরিচালকের তকমা কেউ কেউ দিয়েছেন। জীবন কিন্তু আজও melodrama-বহির্ভূত নয়। সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্ত ঈশ্বর টাকায় কেনা গান শুনতে দুর্ঘটনায় স্বামী হারানো নিরুপায় শিশুসন্তানের জননী তাঁর নিজের বোনের কাছে নিয়তি-নির্দিষ্টভাবেই যেন পৌঁছে যায়। প্রাণপ্রিয় বোনের দিকে বিড়ম্বিত দাদা ঈশ্বরের ঘোলাটে চাউনি মুহূর্তে তড়িদাহত হয়। সীতা (মাধবী) অন্তিম মুহূর্তে আঁশবঁটি নিয়ে মনুষ্যত্বের এই চরম অবমাননায় ইতি টানে। মৃত মাধবীর মুখে ঋত্বিকের কিশোর বয়সে অনুভব করা এক অপার্থিব শান্তি নেমে আসে। ঘাম, কান্না বোনের রক্তস্রোতে ভাসা পরাজিত, বিধ্বস্ত ঈশ্বর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

একটি পরিবারের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়া কী কারণে? এশিয়ার অন্যতম সম্ভ্রান্ত চলচ্চিত্র পত্রিকা Cinemaya-র বিশ্লেষণে সেরা ছবিগুলির তালিকায় সুবর্ণরেখা ১১তম স্থানে রয়েছে। মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার ২৩১, ৩৪৬ ক্রমানুসারে অবস্থিত। তিনটিকেই ঘটকের পার্টিশান ট্রিলজি বলা হয়। সেই বিচারকরা কিন্তু দেশ ব্যবচ্ছেদের বিষয় অবগত ছিলেন না, পরিচালকের নান্দনিক উৎকর্ষতাকেই আবশ্যিক মানদণ্ড করেছিলেন। এখানে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন সুবর্ণরেখার মুখ্য চরিত্রাভিনেতা অভি ভট্টাচার্য। অপঘাত মৃত্যু হলে পুলিশ তদন্ত হয়। সীতার মৃত্যুর পর ঈশ্বর পরের দিন সংবাদপত্র অফিসে খবর দিতে গেলে সে সময় টেলিপ্রিন্টারে গান্ধীজীর গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর এসে পৌঁছয়। অভি লিখেছেন এত বড়ো তোলপাড় ফেলে দেওয়ার খবরে কিন্তু সংবাদপত্র দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য দেখানো হয়নি। এই নীরবতা হয়তো ইচ্ছাকৃত। দেশভাগকে অস্বীকার করার শেষ ব্যর্থ প্রতিবাদ। তিনি বিভাজনকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেননি। উৎপাটিত মানুষের পুনর্বাসন, আর্থিক সংকট থেকে আত্মিক সংকট, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সমাজ জীবনকে ক্রমশ বিপর্যস্ত করে তোলার শেকড় রয়েছে দেশভাগে।

অসীম মায়া ছিল ঋত্বিকের অবিভক্ত বাঙ্গালি সমাজ এবং তার মানুষ, প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর। 'কোমল গান্ধার'-এ ভৃগু ও অনসূয়া দেখে মালগাড়ি shunting হওয়ার মতো একটি বগি পাকিস্তানে চলে গেল, বাকিটি রয়ে গেল এদিকে। বিচ্ছেদের সাক্ষী রইল সমান্তরাল রেললাইন। এই দৃশ্যে ঋত্বিকের অন্তরবেদনা পর্দায় যেন অনুভূত হয়।

এরপর তো ৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশ হতে তিনি বেজায় খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু তা কতক্ষণ স্থায়ী ছিল তা লিখেও গেছেন, ''দুই বাঙ্গলার যৌথ প্রচেষ্টা 'তিতাস' করতে বাংলাদেশের আমন্ত্রণে যাচ্ছেন। অতিথি হিসেবে সত্যজিৎবাবু বিমানে পাশে বসে আছেন। যখন পদ্মা ক্রস করছি আমি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম। ছবি তৈরি করতে করতে বুঝলাম, কিছু নেই সব হারিয়ে গেছে। ইতিহাস বড়ো নিষ্ঠুর।'' অর্থাৎ যা বলেননি হিন্দু বাঙ্গালি তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। হাতে রইল সব হারিয়ে যাওয়া আর নিষ্ঠুরতা। ঋত্বিক ঘটক ব্যক্তিগতভাবেও সব হারিয়েছিলেন দেশভাগকে ছবিতে প্রকাশ করতে গিয়ে। এই তীব্র বাস্তব সত্যকে মানুষ সহ্য করতে পারেনি। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথকে মাথায় রেখেছিলেন। —'শিল্পকে সুন্দর হতে হবে কিন্তু তার আগে তা হবে সত্য,' এই ছিল ঋত্বিকের মন্ত্র। একথা তিনি লিখেও গেছেন। কোমল গন্ধার করতে নিজের ও পরিবারের যা কিছু ছিল সব দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যান। নেশাগ্রস্ত হয়ে হারিয়ে যাওয়ার প্রান্তে পৌঁছন।

দ্বিতীয় নিষ্ঠুরতার প্রসঙ্গটি জটিল। সকলে জানেন ঋত্বিক কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন। তিনি যে-দেশভাগের জন্য ছন্নছাড়া হয়ে গেলেন তাঁর দল কিন্তু সেই দেশভাগ সমর্থন করেছিল। 'মুসলমানরা পৃথক জাতি, পাকিস্তান তাদের জন্মগত অধিকার'। এগুলি ৪০-এর দশকের কথা। ঋত্বিক এ বাঙ্গলায় পাকাপাকিভাবে এসেছিলেন ১৯৪৬ সাল নাগাদ। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে তিনি স্নাতক হন ৪৮-এ। ৪০-এর দশকের গোড়া থেকে দেশভাগ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত স্বরূপ ও ভূমিকা তাঁর জানা ছিল না। তাঁর ছিল গভীর সাম্যবাদী আদর্শবোধ। এমএ পড়া ছেড়ে তিনি স্বাধীন ভারতে আইপিটিএ-তে যোগ দেন। একের পর এক লিখে চলেন মেহনতি মানুষের উত্তরণের নাটক— জ্বালা, দলিল, সাঁকো, জ্বলন্ত। সঙ্গে চলে অভিনয়। এই নাটকগুলি বহুলাংশে চিরকালীন ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে কল্পনা। ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্রগুলির উপমা ও সেগুলির উপস্থাপনাকে দল বুর্জোয়া সংস্কৃতি বলে আখ্যা দিল। দল চার্জশিট দেওয়ার পর on the cultural front নামে তাঁর দলিলে ঋত্বিক সংস্কৃতির সনাতনী বহমান ধারাকে অশ্রদ্ধা করার মধ্যে কোনো যুক্তি খুঁজে পান না বলে জানান। দল তাঁদের আসন্ন নির্বাচন লড়ার টাকা তুলতে 'using cultural front as a money earning machine...'' বলে বিস্ফোরণ ঘটালেন। ১৯৫৫ সালেই তাঁকে দল থেকে তাড়ানো হয়। প্রসঙ্গত তাঁর প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের অমুক্তিপ্রাপ্ত 'নাগরিক' (১৯৫২) ছবির নায়িকাদের নামও ছিল সীতা ও উমা। ততদিনে ঋত্বিক দলের দেউলেপনা ধরে ফেলেছিলেন। ঋত্বিকের প্রকৃত চলচ্চিত্র জীবন এর পরই শুরু হয়। সর্বহারার প্রতি চির-দায়বদ্ধ, বিভাজনের শিকার অসহায় মানুষগুলির বেদনায় আজীবন সমব্যথীর ওপর দল ছিল এতটাই নিষ্ঠুর।

নিজের সত্যনিষ্ঠা ও আপোশহীনতা অমলিন রেখে ঋত্বিক 'তিতাস' শুরু করলেন পরম মমতায় কুমারী মেয়েদের মাঘমণ্ডল ব্রত পালনের 'লীলাবতী লীলাবতী...' গানের ঝংকারে। শেষ ছবি 'যুক্তি তক্কো'য় একেবারে অবিভক্ত বাঙ্গলার প্রতিরূপ বঙ্গবালা হিসেবে আনলেন শাঁওলী মিত্রকে। আবহমান সংস্কৃতি সংরক্ষণের সংকেত হিসেবে এল ছৌ নাচ। নিজে হলেন নীলকণ্ঠ বাগচী (বাগচী তাঁর আসল পদবি)। আদ্যন্ত জরিপ করলে ও পরলোক মানলে মানহারা উদ্বাস্তুর নবোত্থানে 'নাগরিকতা বিল' তাঁকে আপ্লুত করত। এমনটা ভাবলে ভুল হয় না। ■



চিরসখা হে

সারদা সরকার

সংসারগহনে
নির্ভয়নির্ভর,
নির্জনসজনে সঙ্গে রহো।।
অধনের হও ধন, অনাথের নাথ
হও হে, অবলের বল।
জরাভারাতুরে নবীন করো
ওগো সুধাসাগর।।

সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ছিলেন বাইরে থেকে দেখতে যেন শুকনো সাধু। কিন্তু ত্যাগীবর ঠাকুরটির ভিতর যে ভালোবাসার ফল্গুধারা ছিল তা প্রতিনিয়ত সকলকে ছুঁয়ে যেত। আর এই ভালোবাসায় কোনো তারতম্য ছিল না। আপামর মানুষ যেই এসেছে কাছে, পেয়েছে তার ভালোবাসার স্পর্শ। কঠিন নিয়ম যেমন ছিল আবার সব নিয়মহীন বাঁধনহীন ভালোবাসায়ও ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন ভক্তদের। ভক্ত নয়, আসলে তো তারা সন্তান। ঠিক যেন নিজের মা, মুখের কথা নয়, পাতানো মা নয়, ঠাকুর যেন ছিলেন সকলের সত্যিকারের মা।

ওঙ্কারনাথ যে শুধু গৃহী সেজেছিলেন তা নয়, ঘাতপ্রতিঘাতে জর্জর, দারিদ্র্যের কঠোর কষ্ট, আত্মজন বিয়োগ, সংসারীর জীবনে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের এক মহাপ্লাবন যেন— সেই উত্তাল তরঙ্গের কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি ছিলেন শান্ত, স্থির, প্রসন্ন ও নির্বিকার। এ যেন আমাদেরই শিক্ষা দেবার জন্য। আপনি আচরি ধর্ম শিখিয়ে গেছেন। রোগ এসেছে বারে বারে। ভীষণ সব ব্যাধি। করাল ব্যাধির সঙ্গে তাঁর লড়াই চালু ছিল শেষ দিন অবধি। একটি পা অকেজো হয়ে গেল। কিন্তু বাকি এক পায়ে তিনি কোটি বিশ্ব ধারণ করতে পেরেছিলেন যেন। আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে তাঁর কর্মকাণ্ডই তার প্রমাণ দেয়।

বড়ো অমানী আমাদের প্রিয় ঠাকুরটি। এমন ঘটনাও হয়েছে, পরম আগ্রহে, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ঠাকুর গেছেন কোনো খ্যাতনামা ধর্মগুরু বা যোগীকে দর্শন করতে কিন্তু সেই মঠের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, ঠাকুর ফিরে এসেছেন কিংবা হয়তো যাঁকে দেখতে গেছেন তিনি দেখাও করেননি অভ্যর্থনা করেননি, প্রত্যাখ্যাত অবমানিত অনাদৃত কিন্তু শান্ত অবিচলিত অক্ষুব্ধ। শ্রদ্ধা, সম্মান এবং সমাদরও পেয়েছেন অনেক, কিন্তু তাঁকে সেসবও স্পর্শ করেনি। তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী আমাদের ঠাকুরটি গীতার শ্লোক যেন মনুষ্যরূপ ধারণ করে এসেছেন আমাদের শেখাতে।

শিখিয়েছেন নামগান করতে। বলেছেন, সংযত হয়ে জপ করতে পার না? ভালো, তাহলে এক কাজ কর, অনুক্ষণ—

''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে''
অথবা, ''শ্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম''
অথবা, ''সীতারাম সীতারম সীতারম''

—এই মধুর নাম করতে করতে নাচো। অখাদ্য খেয়ে, অকার্য করে দেহটা অশুদ্ধ হয়ে গেছে। নাম করে করে শুদ্ধ হলেই সেই মন-প্রাণ- বিমোহন বাঁশি শুনতে পাবে— পাবে— পাবেই পাবে। ''নামি যেমন স্থির, নামও তেমনি স্থির। নামের সঙ্গ করতে করতে মন স্থির হয়ে যাবেই। যাঁহারা সর্বদা 'শ্রীরাম রাম রাম' বলেন, তাঁহাদের ভোগ ও মোক্ষ লাভ হয়, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। নিত্য নিয়মিত 'শ্রীরাম রাম রাম' নাম যত্নপূর্বক শুদ্ধভাবে লিখলে রোগী রোগমুক্ত হবে, ভোগী তার অভিলাষিত ভোগ লাভ করবেই করবে।' 'মানবই সাধন বলে দেবতা, সাধনহীন মানবই প্রেত পিশাচ।' 'আমি দুইটি। একটি 'পচা আমি আর একটি সাচ্চা আমি'। 'পচা আমি হলো— আমি দেহ এই বোধ, এই অজ্ঞান। আর 'সাচ্চা আমি'— আমি আত্মা,। শ্রীভগবানের দাস,

তাঁর যন্ত্র।'

পুণ্যতীর্থ ওঙ্কারেশ্বর। ১৩৬৬ সাল। সীতারাম চলেছেন শিবলিঙ্গ দর্শনে। রাস্তার দু'পাশের আবালবৃদ্ধবনিতা রাস্তা আটকায় পদে পদে। এমন বরণীয় পথিকের চরণে প্রণাম না জানিয়ে কেউ থাকতে পারে না।

মন্দিরে পৌঁছান সীতারাম, সঙ্গে নামের প্রবল বন্যা। অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি হয়ে চলেছে। সামনেই বৃষরাজ। স্থিরভাবে যুগ যুগ ধরে যেন প্রতীক্ষারত। বৃষরাজের মুখে এক মুঠো বেলপাতা গুঁজে দিয়ে ঠাকুর পুরোহিতের দিকে তাকান— ''খাচ্ছে না যে!// পুরোহিত হো হো করে হাসেন। কিন্তু সত্যিই যদি বৃষরাজ নড়ে চড়ে উঠে মুখ বাড়ায় আর হেলে দুলে চত্বরময় শিং নাড়ে, তবে কি একটাও ফলমূল বাকি থাকবে, না নির্ভয়ে কেউ মন্দিরে আসবে?

'একটুও জল খাবে না?'— ঠাকুরটির সাদর জিজ্ঞাসা। বৃষরাজের মুখে ফলজল ধরে রইলেন খানিকক্ষণ। বৃষরাজের ক্ষুধার কোনো লক্ষণই দেখাচ্ছে না, তাই ঠাকুর হাসতে হাসতে ফলগুলি পূজারির হাতে দিয়ে দেন। আর বৃষরাজের মাথায় ঢালেন শুধু জল— নর্মদার পুণ্যবারি! এবার বৃষরাজ পরমানন্দে চোখ বোজে। দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে প্রেমাশ্রু। —সবাই কি দেখতে পায়? এ দেখার আলাদা চোখ চাই।

শুধু শুকনো সাধু ছিলেন না আমাদের প্রিয় সখা সীতারাম। রসরাজ সীতারাম হাসির গল্পের রাজা! তাঁর গল্প বলার কী সাবলীল ভঙ্গি কী নাটকীয় বর্ণনা! কী শিক্ষণীয় ব্যঞ্জনা! সীতারাম কর্মী গুরু ও অকর্মা শিষ্যের গল্প বলছেন সেবকদের আলস্য পরিত্যাগ ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য।

গুরু-শিষ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন। আগে গুরুদেব, পিছনে শিষ্য। অনেক পথ চলার পর আহারের প্রয়োজনে কিছুক্ষণ যাত্রা বিরতি। গ্রামাঞ্চলে এক বৃক্ষতলে রান্নার জায়গা বাছলেন গুরুদেব। রান্না চাপানো হবে, কাঠের দরকার। শিষ্যকে ডাক দিলেন, কারণ সেবার কাজে তারই তো অগ্রাধিকার। ঝোপের আড়াল থেকে ধ্যানস্থ চেলার কাতর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'গুরুদেব, মালায় আছি।' 'আহা থাক।' এই বলে দয়াল গুরু নিজেই উনুন ধরিয়ে রান্না চাপালেন। এবার জল ও বাটনা দরকার। আবার সস্নেহ আহ্বান। আবার বিনীত প্রত্যাখ্যান, 'গুরুদেব মালায় আছি।' আহা থাক'। অগত্যা গুরুদেব নিজেই জোগাড় করে নিলেন। রান্না শেষ করে দুটি পাতা পাতলেন। এইবার ডাক দিলেন, 'কই হে বৎস, এসো, প্রসাদ যে প্রস্তুত।' এতক্ষণে শিষ্যটির হুঁস হলো। 'যাই প্রভু, কাঁহাতক আর গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করা যায়।'

গল্প শেষে ঠাকুর বললেন, ''দেখো, এমন চেলা যেন হয়ো না।''

উপোস পালা

একাদশীতে উপবাস করলে শ্রীশ্রী ঠাকুর বড়ো খুশি হন। ভোগ নিতে বসে বললেন— ''উপ অর্থাৎ সমীপে বাস। এই হলো উপবাস। উপবাসে মনোবহা নাড়ীগুলি ক্ষীণ হলে— ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা কমে। তাই ব্রতোপবাসের নিয়ম। সামনে সাজান ভোগের থালার দিকে তাকিয়ে —হ্যাঁ এই না হলে একাদশী। একাদশী মানে হলো একাদশবার ভোজন। জানিস তো রানির উপোস পালার কথা— তবে শোন—

''আজ রানির উপোস পালা
বাইশ নারকেল তেইশ কলা
তা খেয়ে রানি শুলেন খাটে
চব্বিশ নফরে আম কাটে।
তা খেয়ে রানি তোলেন হাই
সরো সরো রাজা পাছে তোমায় খাই''।

কী উপবাসের তোড়। শুধু তোড় নয় তোড়জোড়

শুনে সবাই হাসে। শ্রীশ্রী ঠাকুরও শিশুর মতো হাসতে থাকেন।

কিঙ্করী কৃষ্ণপ্রিয়া লিখছেন— শ্রীগুরুদেবের সেবা করা নিয়ে বিভ্রাট লেগেই থাকে। সেই প্রসঙ্গে কোনো কথা বলতে গিয়ে শ্রীহৃষীকেশ আশ্রমে ফলভোগে বসে শ্রীশ্রীবাবা বলছেন— একজনের খুব কঠিন অসুখ করেছে। একদম শয্যাশায়ী। বৈদ্য এসে রোগ পরীক্ষা করে ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন— ঠিকমতো যেন ওষুধ খাওয়ানো হয়— বড়ো কড়া রোগ। ওষুধের দোকান থেকে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে একটা মিক্সচার শিশিও দিল। শিশিটির গায়ে কাগজে লেখা আছে— 'রোগীকে খাওয়াইবার পূর্বে নাড়িয়া খাওয়াইবেন।' সেবাকারীর খুব নিষ্ঠা, যেমনটি বলা তেমনটি ঠিক করা চাই। ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে শিশির গায়ে লেখাটা পড়ে রোগীকে ধরে খুব কষে নাড়িয়ে দিল। আর তাতেই রোগীর মরবার জোগাড়— নাভিশ্বাস ওঠে আর কী!

সকলের হাসি। শ্রীশ্রীবাবা নিজেও হাসছেন। সে হাসিতে সেবাবিপর্যয়ে তাঁর অসুবিধার কথা তখন আর মনে রইল না।

ঠাকুরের জন্মদিনে ফাল্গুনের মধুমাস যেন মধুময় হয়ে ওঠে। মাঘমাসের পঞ্চমী যেমন দেবীসরস্বতীর, তেমন ফাল্গুনের এই তিথিও ওঙ্কার পঞ্চমী তাঁর লক্ষ লক্ষ ভক্তসন্তানের কাছে। ঠাকুরের হাসি, ঠাকুরের স্নেহের শাসন, নিয়ম নিষ্ঠা, নামপ্রেম সব কিছু ছাপিয়ে মধুর ভাব ছড়িয়ে যায় আকাশে বাতাসে।

'বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরম
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।'

চিরসখা হে তুমি প্রাণের ঠাকুর সীতারাম— আজ ফাল্গুনের এই দিনটিতে তোমাকে প্রণাম জানাই।

(শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)



মহাবীর লাচিত বরফুকন

জহরলাল পাল

১৬৬২ সালে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমোল্লার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী অসম আক্রমণ করে এবং আহোম রাজ্যকে করতলগত করে। তখন আহোম রাজ্যের রাজা ছিলেন স্বর্গদেও জয়ধ্বজ সিংহ। তিনি আহেম রাজ্যের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলেও কৃতকার্য হননি। তাঁর মৃত্যুর পর আহোম রাজ্যের সিংহাসনের অধিকার লাভ করেন চক্রধ্বজ সিংহ। জয়ধ্বজের অপহৃত ক্ষমতা ফিরিয়ে পেতে চক্রধ্বজ সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি গভীর জ্ঞান সম্পন্ন কূটনীতিবিদ, বুদ্ধিমান, নিঃস্বার্থপর এবং বিশ্বাসী একজন সুদক্ষ যুবকের সন্ধান করতে লগলেন যাকে সেনাপতিরূপে নিযুক্তি দেওয়া যেতে পারে। পরিশেষে মোমাই তামুলী বরবরুয়ার পুত্র সাহসী লাচিত বরবরুয়াকে সেনাপতি রূপে নিযুক্তি প্রদান করেন এবং তাঁকে বরফুকন উপাধিতে ভূষিত করেন। সেনাপতি হওয়ার পর লাচিতের প্রধান দায়িত্ব হয়ে ওঠে মোগল আধিপত্য খর্ব করা।

১৬৬৫ থেকে ১৬৭১ সালের সময় কালের ঘটনা প্রবাহে লাচিতের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের প্রকৃত ছবিটি প্রতিফলিত হয়। রাজপুত বীর রামসিংহের মতো চতুর সেনাপতি বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে অসম আক্রমণে এসেছিল কিন্তু গুয়াহাটি প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে লাচিতের তৎপরতা ও রণকৌশল অতি সময়োপযোগী ছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে লাচিত বলেছিলেন, ‘‘যুদ্ধ অবহেলাকারীদিগকে আমি হত্যা করতে বাধ্য হব।’’ অসমীয় সৈন্যরা যুদ্ধে জয়লাভ করবেই— এরূপ ধারণা লাচিত সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব থেকেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন। রামসিংহের সৈন্যদিগকে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে লাচিত তার মাতুলকে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে পর্বত সংযোগ দ্বারা গড় নির্মাণ করে মোগল সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করার আদেশ দেন। এক রাতের মধ্যে এই গড় নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য মাতুলের প্রতি নির্দেশ ছিল। কিন্তু নির্দেশ মতো কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় লাচিত ‘মাতুলের থেকে দেশ বড়ো’ বলে নিজ তরবারির আঘাতে মাতুলকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন। লচিতের এরূপ দৃঢ়প্রত্যয় প্রত্যক্ষ করে অন্যান্য কর্মকর্তারা ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে প্রয়োজনীয় কাজের বাকি অংশ সময়ে সম্পূর্ণ করতে বাধ্য হয়েছিল। যার ফলে মোগল সৈন্যকে গুয়াহাটী প্রবেশে বাধা প্রদান করতে লাচিত সৈন্যরা সফল হন। এরূপে লাচিত বরফুকন ১৬৬৭ থেকে ১৬৭১ সাল পর্যন্ত সময়ের ভিতর বহু দুর্গ তৈরি করে নিজ দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে একসময় লাচিত অসুস্থ হয়ে পড়েন। মোগল সৈন্যদল লাচিতের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে আক্রমণের অপেক্ষায় থাকে। রামসিংহ নৌ যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে। লাচিতের অবর্তমানে অসমীয় সৈন্যদল ভগ্নমনোবল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় অসুস্থ শরীরে লাচিত রোগশয্যা থেকে বলে ওঠেন, ‘‘আমি বেঁচে থাকতে কিছুতেই শত্রুকে আমাদের দেশে ঢুকতে দেব না।’’ লাচিত তৎক্ষণাৎ রণতরীতে উঠে ছয় খানা যুদ্ধজাহাজ সহকারে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। লাচিতের উৎসাহে সৈন্যদল বীরবিক্রমে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। এ সময় গুয়াহাটীর ইটাখুলিতে মোগলদের সব থেকে শক্তিশালী শিবির ছিল। এ শিবিরে তাদের প্রধান সেনাপতিরা এবং মীরজুমোল্লা-সহ অন্যান্য পদস্থ সকলের পরিবার তথা মোঘলদের সাহায্যকারী কিছু অসীমায় আধিকারিকও ছিল। সুরক্ষিত এই শিবিরের চারদিকে বড়ো বড়ো কামান বসানো ছিল। যার ফলে ইটাখুলি দখল করাটা লাচিতের সৈন্যদের জন্য খুবই কঠিন ছিল।

এমন অবস্থায় ইটাখুলি কম সময়ের মধ্যে দখল করা সম্ভব না হলে এবং নিম্নাঞ্চল থেকে অধিক মোগল সৈন্য এসে গেলে সকল পরিকল্পনাই ধূলিসাৎ হবে। তখন লাচিত রাতের অন্ধকারে গোপনে সৈন্যদের দ্বারা মোগলদের স্থাপিত কামানের মধ্যে জল ঢুকিয়ে দেন। কামানগুলি অকেজো হয়ে পড়লে, অসমীয় সৈন্যরা ইটাখুলি শিবিরে ঢুকে মোঘলদিগকে কচুকাটা করে। মোগলদের কিছুলোক পালিয়ে যায়, অন্যরা বন্দি হয়। বহু ঘোড়া, কামান ও অস্ত্রশস্ত্র অহোমদের হস্তগত হয়। এইরূপে লাচিত বরফুকনের নেতৃত্বে গুয়াহাটী-সহ অসমের নিম্নাঞ্চল পুনরায় আহোম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

লাচিত বরফুকনের বীরত্ব সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বী মোগল সেনাপতি রামসিংহ প্রশংসার সুরে বলেছিলেন— ‘‘বরফুকন একজন উচ্চ প্রকৃতির যোদ্ধা। ধন্য আহোম রাজা, ধন্য মন্ত্রী, ধন্য সেনাপতি, ধন্য সেনা যেখানে একজন লোকই সমগ্র সেনা বাহিনীকে পরিচালনা করতে সক্ষম।’’ ■



শিব ও শিবরাত্রি

স্বপন দাশগুপ্ত

দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের স্থান অতি উচ্চ। এঁদের মধ্যে ব্রহ্মা সৃজনকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা, মহাদেব সংহারকর্তা রূপে সাধারণত পরিচিত হন। বাঙ্গলায় এই মহাদেব বা শিবকে প্রথম দেখা যায় সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্র হরপ্পায় প্রাপ্ত সিলমোহরে— কৌপীন পরিহিত এক জটাধারী যোগী চারকোনা বেদিতে উপবিষ্ট। তাঁর তিনটি মুখ, দুটি শিং, দুটি হাত, পাশে হাতি, বাঘ, গণ্ডার ও মোষ। এই মূর্তিটিকেই পৌরাণিক শিবের প্রথম প্রতীক আদিশিব হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রায় ২৩০০ বছর পূর্বে ভারতবর্ষে শিবপূজার প্রচলন হয় এবং আরও ৪০০ বছর পরে মূর্তিপূজা শুরু হয়।

মহাদেব ধূম্ররূপী বলে তিনি ধূর্জটি। মানুষের নিয়ত মঙ্গল কামনা করে বিবিধ কর্মের দ্বারা তাদের উন্নত করেন বলে তিনি শিব। পশুদের অধিপতি ও পালন কর্তারূপে তিনি পশুপতি। ডমরু এঁর প্রিয় বাদ্য, কৈলাস প্রিয় ধাম, প্রমথগণ প্রিয় সহচর। হলাহল পানে নীলকণ্ঠ হেতু তিনি 'নীলকণ্ঠ'। সর্বগুণান্বিত সর্বত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ তিনি। রাগদ্বেষহীন, আসক্তি বর্জিত, সদা সন্তুষ্ট আনন্দময় শিব, হিন্দু জীবনে এক মহান আদর্শ।

শিবরাত্রি একটি অতি প্রাচীন হিন্দু উৎসব যা স্মরণাতীত কাল থেকে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। সাধারণত দেবাদিদেব শিবের বিবাহ দিনটিকে স্মরণ করে এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতি বছর এই উৎসব পালন করা হয়। ইংরেজির ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাস এবং বাংলার ফাল্গুন মাসে শীতকালের শেষে বা গ্রীষ্মের প্রথমে এই মহা-শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এটি হিন্দুদের ঘরে ঘরে পালিত একটি পবিত্র উৎসব বা ব্রত। ভগবান শিবের স্মরণ নিয়ে জাগতিক ও পার্থিব অন্ধকার ও অজ্ঞতা দূরীকরণই এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য। ভক্তেরা সারাদিন উপবাসী থেকে শিবের ভজন ও ধ্যানযোগে এই মহা শিবরাত্রি ব্রতপালন করেন। আত্মসংযম, সততা, ক্ষমা, অন্যের ক্ষতি সাধন না করার সংকল্প নিয়ে মহাদেবকে আত্মস্থ করার চেষ্টাই এই ব্রতের প্রধান উদ্দেশ্য। নারী ও পুরুষ উভয়েই এই ব্রত পালন করার অধিকারী।

এই উৎসবকে জাগরণ উৎসবও বলা হয়। শিবরাত্রির দিন রাত্রে চার প্রহরে চারবার শিবপূজা করাই বিধেয়। চার প্রহরে দুধ, দই, ঘি, মধু ইত্যাদি উৎসর্গ করে ভক্তিসহকারে শিবলিঙ্গকে স্নান করিয়ে প্রার্থনা করা হয় এবং নানাবিধ আমোদপ্রমোদের সঙ্গে রাত্রিযাপন করা হয়। কোনো কোনো ভক্ত সারাদিন উপবাসী শিবের পবিত্র মন্ত্র 'ওম্ নমঃ শিবায়' উচ্চারণ করে বৈদিক বা তান্ত্রিক মতে শিবরাত্রি পালন করেন।

বিভিন্ন পুরাণ বিশেষ করে স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ ও পদ্মপুরাণে শিবরাত্রির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মধ্যযুগে শৈব পুস্তকে শিবমূর্তি বা লিঙ্গ পূজার কথা বলা হয়েছে। প্রচলিত কাহিনি মতে মহা-শিবরাত্রির দিনটি শিব-পার্বতীর বিবাহের দিন। ওই দিন শিবলিঙ্গের পূজা করলে পুরানো সব কলুষ দূরীভূত হয়ে নতুন ধর্মীয় ও পবিত্র জীবনের পথে মুক্তিলাভ ঘটে।

কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে শৈবভক্তরা এই উৎসবকে 'হররাত্রি' উৎসব বলে। ভারতের কেনারক, খাজুরাহ, মাদুরাই, চিদাম্বরম প্রভৃতি বিখ্যাত শিবমন্দিরে নাচের মাধ্যমে এই উৎসব পালিত হয়। তাই এই উৎসবকে 'নৃত্যাঞ্জলি' উৎসব বলা হয়। তাছাড়া তামিলনাড়ুর আন্নামালাই মন্দিরে খুব ধুমধামের সঙ্গে এই উৎসব পালিত হয়।

ভারতের প্রধান জ্যোতির্লিঙ্গ শিবমন্দিরে বিশেষ করে বারাণসী ও সোমনাথের মন্দিরে বড়ো বড়ো মেলা ও নানাবিধ বিনোদনের মধ্য দিয়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্জাবের হিন্দুদের কাছে শিবরাত্রি এক মহাউৎসব। এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলি শোভাযাত্রার সঙ্গে এই উৎসব পালন করে। গুজরাটের জুনাগড়ে শিবরাত্রির দিন বিশাল বিশাল মেলা বসে এবং মুর্গহিকুণ্ডের পবিত্র জলে অবগান করে ভক্তরা পুণ্যসঞ্চয় করেন। কথিত আছে স্বয়ং শিব এই কুণ্ডে স্নান করেছেন।

নেপালে মহা-শিবরাত্রি উৎসবের দিন জাতীয় ছুটি ঘোষিত হয়। নেপালের সব হিন্দুমন্দিরে বিশেষ করে পশুপতিনাথ মন্দিরে হাজার হাজার ভক্ত সমবেত হয়ে ভগবান শিবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিবাহিত মহিলারা তাঁদের স্বামীর মঙ্গল কামনা করেন এবং কুমারী মেয়েরা শিবের মতো আদর্শ স্বামী প্রার্থনা করেন। পাকিস্তানের হিন্দুরা ওইদিন উমরকোট শিবমন্দিরে তিনদিন ব্যাপী উৎসব পালন করেন, এটি পাকিস্তানের হিন্দুদের বৃহত্তম ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তিন লক্ষাধিক ভক্ত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তান হিন্দু পঞ্চায়েত এই উৎসবের সব খরচ বহন করে।

পুরুষ ও নারী উভয়েই এই উৎসব পালন করে। শিবরাত্রি পালন করলে ব্রতীর ধর্ম-কর্ম-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বিধ ফললাভ করেন। এই ব্রত পালনে যে ফললাভ হয় তা দানধ্যান, যজ্ঞ বা অন্যান্য পুণ্যকর্মের দ্বারা সেরূপ ফললাভের আশা করা যায় না।

ত্রিলোকমধ্যে দেবাদিদেব শিব শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞের মধ্যে যেমন অশ্বমেধ, তীর্থের মধ্যে গঙ্গাসাগর তেমনি সমস্ত ব্রতের মধ্য মহাশিবরাত্রি সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে গণ্য করা হয়। ▮



গোলাপি আলোর বন্যায়

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ মহালয়া। আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি। কিছুক্ষণ আগে রেডিয়োয় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ শেষ হয়েছে। ভোরের ঝক্‌ঝকে নীল আকাশের বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের দল ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা হালকা বাতাস বইছে। পারমিতা এই সময় তাদের আবাসনের ছাদে সদ্যকাচা জামাকাপড় শুকোতে দিতে উঠেছে। তারের উপর জামাকাপড় মেলে দেবার পর সে কার্নিশের কাছে এসে নীচে রাস্তার দিকে তাকায়। দেখে ধুতিপরা, গায়ে গামছা জড়ানো কয়েকজন শুভ্রকেশ বৃদ্ধ তর্পণ করতে রওনা দিয়েছে। পুজো তাহলে এসে গেল।

এমন একটা মন ভালো করে দেওয়া পরিবেশের মধ্যেও হালকা বিষাদের ছায়া মনকে বিষণ্ণ করে দেয়। মায়ের কথা মনে পড়ে। গত বছরও মহালয়ার দিন মা টেলিফোন করে বলেছিল, রেডিয়োয় মহালয়া শুনেছিস? প্রায় সাত মাস হলো মা ওদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে চিরকালের মতো।

সেই ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে। মহালয়ার দিন বাবা ভোরবেলায় উঠে রেডিয়োটা চালিয়ে দিত। সারা বাড়ি জুড়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠত। ''আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জরী, ধরণীর বহিরাকাশে...।'' বিছানায় শুয়ে ঘুম চোখে শুনতো এই চণ্ডীপাঠ। কিছুক্ষণ পর আবার ঘুমিয়ে পড়তো। ঘুম থেকে উঠে দেখত চণ্ডীপাঠ কখন শেষ হয়ে গেছে। মাকে জিজ্ঞাসা করলে মা বলতো 'বাজল তোমার আলোর বেণু' গানটা শুনেছিস? সে বলতো হ্যাঁ। তখন মা বলতো 'ব্যাস তাহলেই হবে। ওটাইতো মহালয়ার আসল গান রে।'

পারমিতা ছাদ থেকে নেমে আসে। এরপর শুরু হবে তার প্রাত্যহিক জীবনের ব্যস্ততা। কাজের মাসি শিখা কিছুক্ষণ আগে এসে ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। স্বামী সুজিত আর কিছুক্ষণ পরই মর্নিংওয়াক থেকে ফিরে বাথরুমে ঢুকে যাবে। সে রান্নাঘরে গিয়ে তার নিত্যকর্মপদ্ধতির মধ্যে প্রবেশ করে।

এরই ফাঁকে ফাঁকে দুই কন্যা দেবাঞ্জনা ও শুভশ্রীকে ঘুম থেকে তোলার জন্য বারে বারে তাগাদা দিতে হবে।

আধঘণ্টা বাদে কলিং বেলের টুংটাং শব্দ ওঠে।

পারমিতা দরজা খুলে দিলে সুজিত ওর হাতে তোয়ালেটা প্রায় ছুঁড়ে দিয়ে গুন গুন করে 'বাজল তোমার আলোর বেণু' গানটা গাইতে গাইতে বাথরুমে ঢুকে গেল। আজ মহালয়ার রেশ ওর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। বাথরুমে ঢুকেও গানটা সে গেয়ে চলেছে। একটু পরে ডাইনিং টেবিলে বসে সুজিত ব্রেকফাস্ট শুরু করে। টেবিলের অন্য প্রান্তে পারমিতা গালে হাত দিয়ে বসে বলে, 'পুজো প্রায় এসে গেল। এই রবিবার যা মার্কেটিং আছে সেগুলো সব সেরে ফেলবো। তুমি কি যাবে?' টোস্টে কামড় বসিয়ে সুজিত বলে, 'পুজোর কদিন অফিস বন্ধ থাকবে তাই এখন ভীষণ কাজের চাপ। এই রবিবারও বেরোতে হবে। আব্দুলকে বলে দিও কখন গাড়ি নিয়ে আসবে। দুই মেয়েকে নিয়ে বাকি কেনাকাটাগুলো সেরে নিও।'

পারমিতা মৃদু হেসে বলে, ওকে স্যার।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে সুজিত ওর ঘরে ঢুকে যায় ধরাচূড়া পরে অফিসের জন্য তৈরি হতে। পারমিতা এর মধ্যে ডাইনিং টেবিলটা পরিষ্কার করে নেয়। বেশভূষা পরে অ্যাটাচি হাতে সুজিত ফ্ল্যাট থেকে বার হয়ে গম্ভীর মুখে লিফটের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। আফটার সেভ এবং বিলিতি পারফিউমের একটা মিশ্র গন্ধ ওর শরীর থেকে ভেসে আসছে। পেছনে পেছনে পারমিতা এসে ওর কাছে দাঁড়ায়। অফিসের ড্রেস পরে হাতে অ্যাটাচি নিলে সুজিতের মধ্যে কীরকম বস বস ভাব এসে যায়। পারমিতা সেটা লক্ষ্য করে, তাই সে কোনো কথা বলে না। সোঁওও করে লিফট এসে দাঁড়ায়। অটোমেটিক দরজা ঘট করে আপনা হতেই খুলে যায়। সুজিত লিফটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হাতঘড়িতে চোখ রেখে বলে, আসছি।

নিজের বৃত্তে ফিরে সে দেখে বড়ো মেয়ে দেবাঞ্জনা ইতিমধ্যেই বাথরুমে চলে গেছে। ছোটো মেয়ে শুভশ্রী তখনো কুণ্ডলী পাকিয়ে বিছানায় শুয়ে আধো ঘুম আধো জাগরণের মৌতাত উপভোগ করছে। সে বিরক্ত হয়ে শুভশ্রীকে ঠেলে দিয়ে বলে, কীরে এবার ওঠ। এরপর তো তো দেরি হয়ে যাচ্ছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে চেল্লাবি।'

রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে দ্যাখে দেবাঞ্জনা ফিটফাট হয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে প্রাতরাশের জন্য অপেক্ষা করছে। পারমিতা ওর সামনে খাবারের ডিশ সাজাতে সাজাতে বলে, 'আজ ম্যাডামের কী প্রোগ্রাম আছে।'

দেবাঞ্জনা খেতে খেতে বলে, সেরকম কিছুই নেই। কলেজ শেষ হলে তাড়াতাড়ি চলে আসতেও পারি।

ততক্ষণে ওদিকে শুভশ্রীর তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ শোনা যায়, মা মোবাইলটা চার্জে বসিয়ে দাও তো।

পারমিতা মৃদু হেসে বলে, 'ওই মহারানি এবার উঠলেন।' দেবাঞ্জনা খেয়েদেয়ে উঠে ধীরে ধীরে কলেজে যাবার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

শুভশ্রীর মধ্যে এখনো একটা ছেলেমানুষি ভাব আছে। ব্যস্ত মৌমাছির মতো সারাটা ফ্ল্যাটের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। মা আর দিদিকে সারাক্ষণ ফরমায়েশ করে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মাকে বলে 'ডিওটা একটু স্প্রে করে দাও তো।'

পরক্ষণেই দিদির দিকে ফিরে বলে, 'হ্যাঁরে, তোদের কলেজের ফেস্টের দিন ঠিক হলো?

পারমিতার স্বামী এবং দুই কন্যা ফ্ল্যাট থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার পর বাড়িটা যুদ্ধশেষে কুরুক্ষেত্রের চেহারা ধারণ করে। পারমিতা আস্তে আস্তে সবকিছু গুছিয়ে যথাস্থানে রেখে দেয়। একটু বেলা হতেই ছাদে গিয়ে জামাকাপড়গুলো তুলে নিয়ে আসে। সেখানে নীচের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা গুজরাটি পরিবারের ছোটো বউয়ের সঙ্গে দেখা হয়। বউটিকে দেখতে খুব মিষ্টি। নামটাও খুব মিষ্টি, মীরজুল মেহতালিয়া। ওকে দেখে বউটা হাসে। ও ভাঙা ভাঙা বাংলাও বলতে পারে। পারমিতা বলে, কী পুজোয় এবার এখানে থাকছো তো?

সে বলে, না ভাবি, আমাদের নওরাত্রি তৌহর আছে। এবার গুজরাটে যাব।

পারমিতা বলে, আচ্ছা।

বউটা খুব মিশুকে। পারমিতাকে একদিন ওদের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়েছিল। ওদের ব্যালকনিটা বেশ বড়ো। সেখানে একটা দোলনা খাটানো আছে। ওদের পরিবারের কর্তা প্রায়ই দোলনায় বসে থাকে। একবার ওকে গুজরাটি খাবার ধোকলা দিয়েছিল। নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে পারমিতা যন্ত্রচালিতের মতো একের পর এক কাজকর্মগুলো করে যেতে থাকে। কিন্তু আজ মাঝে মাঝেই মনে পড়ছে মায়ের কথা। একটা কাঁটার মতো ব্যথা মনের মধ্যে বিঁধতে থাকে। ভাবে মা কি আর কিছুদিন বাঁচতে পারতো না? মায়ের বয়সি কতলোকই এখনো দিব্যি বেঁচে আছে। ওর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে নেয়।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে পারমিতা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। এটা তার রোজকার অভ্যাস। চারপাশের সারা শহরটা ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে। পুরানো আমলের বাড়িঘরগুলো একে একে ভেঙে যাচ্ছে। সেই জায়গায় এক একটা বহুতল গজিয়ে উঠছে। এইসব পুরানো বাড়িগুলোর পিছনে কত ইতিহাস কত কাহিনি লুকিয়ে আছে কেউ তার সন্ধান জানে না। সেইসব ইতিহাস এক এক করে হারিয়ে যচ্ছে। আর এই যে চারদিকে বহুতল গছিয়ে উঠছে সেগুলি বড়ো কৃত্রিম বলে মনে হয় পারমিতার। কেমন নিষ্প্রাণ আর যান্ত্রিক বলে মনে হয়। আগেকার বাড়িগুলোই বেশ ছিল।

তার বুক থেকে একট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। কী আর করা যাবে সবই মহাকালের লীলা। কয়েকটা রাস্তাজুড়ে পুজোর প্যান্ডেল হয়েছে। বাঁশ বাঁধা আগেই হয়ে গেছে। এখন শুধু ডেকরেটার্সের কর্মীরা খুটখাট করে পেরেক ঠুকে কাপড় লাগাতে ব্যস্ত।

এমন সময় টুংটাং করে কলিং বেলের শব্দ ওঠে। ওর চিন্তায় ছেদ পড়ে। দরজা খুলে দিলে শিখা কিচেনে গিয়ে বেসিনে রাখা বাসনপত্রগুলো মাজতে শুরু করে। সব মাজাধোয়া হলে শিখা বলে, বউদি দরজা দিয়ে দাও, চলে যাচ্ছি। দরজাটা বন্ধ করে পারমিতা মোটা মোটা দু'একটা পূজাসংখ্যা নিয়ে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় বসে। তার মধ্য থেকে একটা হাতে নিয়ে পাতা ওলটাতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর তার দুচোখে ঘুম নেমে আসে। দেখে গভীর গাঢ় অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা সাদা আলোর বিচ্ছুরণ। কুয়াশার মতো নানা রঙের বাষ্পকণাগুলি তার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে।

অনেক অনেক দূর থেকে একটা ডাক ভেসে আসছে— খুকি-ই-ই-ই-ই।

শিউলিফুলের গাছের নীচে চান্দ্রেয়ী, সুমিতা, বুড়ি আর তৃপ্তিদের সঙ্গে খুকিও উপুড় হয়ে বসে শিউলিফুল কুড়াচ্ছিল। হঠাৎ বুড়ি বলে ওঠে, 'চল আজ ও পাড়ায় বোসেদের বাড়ি গিয়ে আমরা ঠাকুর তৈরি দেখব। এরপর ওরা যে যার বাড়ি শিউলিফুলগুলি রাখতে যায়। খুকিও বাড়ির ঠাকুরঘরে ফুলগুলো রেখে তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে যায়। মা বলে, 'অ্যাই মেয়ে কোথা যাচ্ছিস?' খুকি পেছনে না তাকিয়েই চিৎকার করে বলে ওঠে, ওপাড়ায় বোসবাড়ি ঠাকুর গড়া দেখতে যাচ্ছি।

মা এবার বিরক্তমুখে বলে ওঠে, ইস্কুলে ছুটি পড়ার পর মেয়ে যেন সাপের পাঁচ-পা দেখছে। খালি এখান-ওখান ধেই ধেই করে ঘুরে বেড়ানো।

বোসেদের ঠাকুর দালানে গিয়ে ওরা এক পাশে দাঁড়িয়ে ঠাকুর গড়া দেখতে থাকে। পটুয়ার নিপুণ তুলির টানে ঠাকুরের অবয়ব ক্রমশ ফুটে উঠছে। ওদের চোখে কেমন বিস্ময়ের ঘোর লাগে। এমন সময় বুড়ি বলে ওঠে, 'জানিস তো দাদু বলেছে এবারের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে না পারলে অসুরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে'। একথা শুনে সবাই হিহি করে হেসে ওঠে। এমন সময় বোসেদের বড়ো গিন্নি ওদের হাতে একটা করে নারকোল নাড়ু দেয়। নাড়ু খেতে খেতে তৃপ্তি বলে এবার বাড়ি চল, না হলে মা আবার বকবে। সবাই বাড়ির দিকে ফিরে চলে।

খুকি বাড়ি এসে দেখে বড়োমামা-বড়োমামিমা এসেছে। খাটের ওপর নতুন জামাকাপড়গুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা আছে। বড়োমামি একটা লাল রঙের ফ্রক ওর হাতে দিয়ে বলে, 'দ্যাখ, এটা তোর জন্য। পছন্দ হয়েছে?' খুকি নতুন ফ্রকের গন্ধ শোঁকে। খুশিতে ওর মনটা কেমন আনচান করে ওঠে। খুকি ঠাকুমা আর দাদুর কাছে পুরনো দিনের দুর্গাপুজোর গল্প শোনে। ঠাকুমার বাপের বাড়ি দুর্গাপুজোয় নাকি মোষ বলি হতো। কিছুদিন পর ঢাকের বাদ্যিতে ঘুম ভাঙে খুকির, আজ ষষ্ঠী। মা দুর্গার বোধন। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে কোনোরকমে জলখাবারটা গলাধঃকরণ করে পাড়ার প্যান্ডেলে গিয়ে হাজির হয়। তার একহাতে খেলনা বন্দুক, অন্য হাতে ক্যাপের রোল। প্যান্ডেলের ভিতর প্রতিমার সামনে বসে পুরোহিতমশাই মন্ত্র পড়ছেন, ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীভবদ্দুর্গাদেব্যাঃ বোধন কর্মনি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ধ্রুবন্তু...। তখন আস্তে আস্তে জড়ো হচ্ছে চান্দ্রেয়ী, বুড়ি, সুমিতা, তৃপ্তি। বাড়িতে জ্যাঠাইমা, মা, কাকিমারা আলোচনা করছে এবারের সন্ধিক্ষণের পুজো পড়েছে রাত এগারোটায়। খুকিও বায়না ধরেছিল সন্ধিপুজো দেখবে। তাই শুনে মা এক ধমক দিয়েছিল, 'হ্যাঁ অতরাতে বাইরে বসে পুজো দেখবে, এখন হিম পড়া শুরু হয়েছে। তারপর হাঁচি, কাশি, সর্দিজ্বর হয়ে একশা হবে।' না আর সন্ধিপুজো দেখতে হবে না। অবশেষে ঠাকুমার কাছে কেঁদে কেটে তবে সন্ধিপুজো দেখার অনুমতি মিলেছিল।

বোসেদের বাড়িতে ওরা সন্ধিপুজো দেখতে গিয়েছিল। বাড়ির উঠোনের একদিকে চেয়ারপাতা হয়েছিল, সেখানে পাড়ার বয়স্ক, প্রবীণ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি বসবেন। অন্যদিকে গালচে, শতরঞ্চি বিছানো হয়েছিল সেখানে বসবে পাড়ার যত মেয়ে বউরা। অপূর্ব এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে পুজো শুরু হলো। পুজোর আসনে বসে রয়েছেন প্রধান পুরোহিত। পাশে তন্ত্রধারক। লালপাড়ে সাদা শাড়ি পরে বাড়ির মহিলারা এবং গরদের ধুতি পরে বাড়ির ছেলেরা পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত। বিভিন্ন রকমের নৈবেদ্য সাজানো রয়েছে। সুগন্ধী ধূপের আমেজে চারদিক মাতোয়ারা হয়ে গেছে। একটা বড়ো থালায় একশো আটটা প্রদীপ জ্বলছে, অন্যদিকে আর একটা থালায় পরিপাটি করে একশো আটটা পদ্ম সাজানো রয়েছে।

চারদিক নিস্তব্ধ, কারো মুখে কোনো কথা নেই।

এমন সময় পুরোহিত গুরুগম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, বিষ্ণুরোম তৎসৎ আশ্বিনে মাসি শুক্লে পক্ষে অষ্টম্যাং নবম্যাং সন্ধৌ সর্বাপন্থান্তিপূর্বক শ্রীভবদুর্গা দেব্যাং স্নপনম্, পূজনম্, বলিদানং, দীপমালাদিদন কর্মান্যতুং করিষ্যে।

কিছুক্ষণ পর ঢাক, কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠল। ধুনোর ধোঁয়ায় চারপাশ ঢেকে যাচ্ছে। শুধু ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে মা দুর্গার মুখটা আবছা দেখা যাচ্ছে। খুকির এবার ঘুমে দুচোখ বুজে আসছে। ঢুলতে ঢুলতে সে মায়ের কোলে ঢলে পড়ল। মায়ের শরীরের ঘ্রাণের সঙ্গে ধোঁয়ায় ঢাকা মা দুর্গার মুখমণ্ডল মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

ঘুমটা ভেঙে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসে পারমিতা। বাথরুমে গিয়ে বেশ করে চোখেমুখে জল দিয়ে বাইরে আসতেই টুংটাং করে কলিংবেলের শব্দ হলো। খুলে দেখে দেবাঞ্জনা দাঁড়িয়ে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে পারমিতার হঠাৎ নিজের মায়ের মুখের সঙ্গে খুব মিল খুঁজে পেল। বিশেষ করে ভুরুদুটো তো একদম তার দিদিমার মতো হয়েছে। দেবাঞ্জনা ক্লান্ত পদবিক্ষেপে বাড়িতে ঢুকে চেয়ারে ব্যাগটা রেখে বলে, 'মা খুব খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও। টয়লেট থেকে ফিরে এসে খাবো।' পারমিতা কিচেনে গিয়ে ওভেনে রান্না চড়ায়। ইতিমধ্যে দেবাঞ্জনা টয়লেট থেকে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পোশাক পালটে ডাইনিং টেবিলে বসে অপেক্ষা করে। কিছুক্ষণ পরে পারমিতা একটা প্লেটে গরম লুচি আর অন্য একটা কাঁচের বোলে হালুয়া এনে টেবিলে রাখে। বলে, 'দ্যাখ, তোর ফেভারিট ডিশ। দেবাঞ্জনা বলে দাঁড়াও আগে হাতটা ধুয়ে আসি। পারমিতা বলে, হাত ধুতে হবে না, আমি তোকে খাইয়ে দিচ্ছি।'

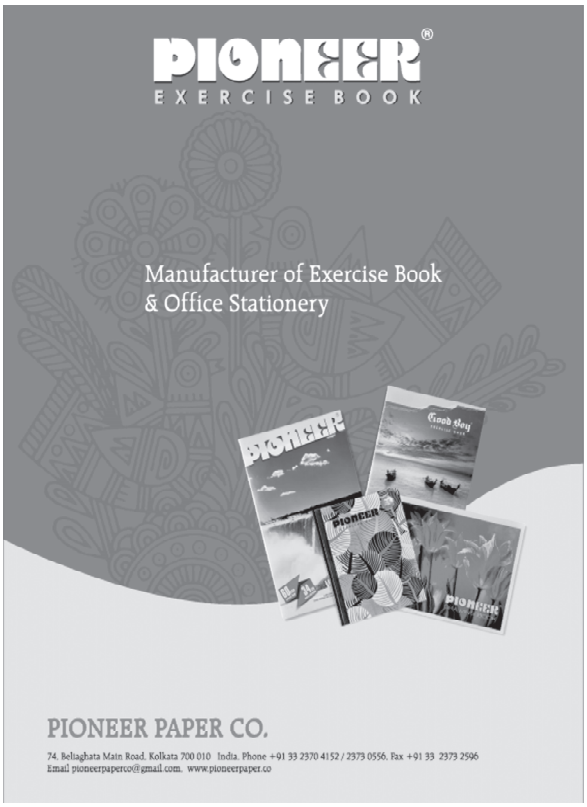
সে পাশে দাঁড়িয়ে একটু একটু করে লুচি আর হালুয়া নিয়ে মেয়েকে খাইয়ে দিতে থাকে। এবার মনে হয় যেন মেয়েকে নয় নিজের মাকে খাইয়ে দিচ্ছে। অপূর্ব এক ভালো লাগার আমেজে মনটা ভরে ওঠে। সব দুঃখ-বেদনা-বিষণ্ণতার ছায়া যেন এক নিমেষেই মন থেকে উধাও হয়ে যায়। সারা আকাশ জুড়ে তখন নেমেছে গোলাপি আলোর বন্যা। পাখির দল ফিরে চলেছে যে যার আপন নীড়ে। দূর দিগন্ত থেকে ভেসে আসছে গানের সুর 'বাজল তোমার আলোর বেণু'। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

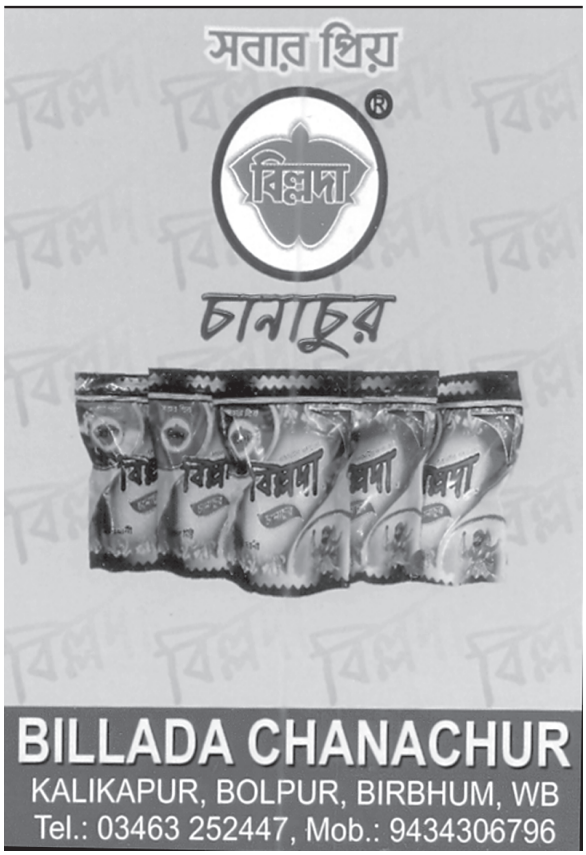
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩



বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

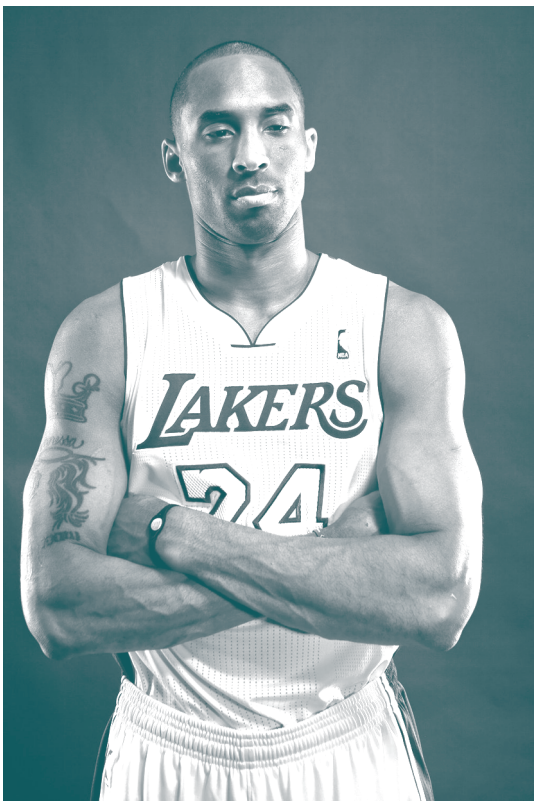


চলে গেলেন জাদুকর ব্ল্যাক মাম্বা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

চলে গেলেন অন্য গ্রহের স্বপ্নের টিমের অন্যতম নিউক্লিয়াস 'ব্ল্যাক মাম্বা বা কোবি ব্রায়ান্ট। ফাইভ মাস্কোটিয়ার্স ম্যাজিক জনসন, মাইকেল জর্ডন, শাকিল অনিল, করিম আব্দুল জব্বার, কোবি ব্রায়ান্ট মিলে গোটা দুনিয়ার মানুষকে এক স্বপ্নময় জাদুবাস্তবতার মধ্যে আবিষ্ট করে রেখেছিলেন বছরের পর বছর। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাস্কেটবল টিমকে এক গ্রহান্তরের দলে পরিণত করেছিলেন যার জন্য মার্কিন সমাজ তা সে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ দুই ক্ষেত্রেই এই পঞ্চ মহারথী এক ম্যাজিকাল রূপকথার জন্ম দিয়ে গেছেন। টানা ২০ বছর কোবি ব্রায়ান্ট এনবিএ অলস্টার টিমে খেলেছেন। সর্বকালের সেরা দল লস এঞ্জেলস লেকার্সকে অতিমাত্রিক উচ্চতায় তুলে দেন। অলিম্পিয়াডে যুক্তরাষ্ট্র দলকে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক জনপ্রিয় খেলা বাস্কেটবলের অমোঘ আকর্ষণ সে উপেক্ষা করতে পারেন না মায় হলিউডের মোহময় দুনিয়া পর্যন্ত তার মূলে এই পঞ্চপাণ্ডব। আর কোবি ব্রায়ান্ট তার বহুমাত্রিক স্কোরিং দক্ষতাও যেন কোর্ট কভারেজ দিয়ে এই পাঁচ মেগাতারকার মধ্যে স্বকীয় উজ্জ্বলতা ধরে রেখেছিলেন অনেক বছর ধরে।

কোবির সঙ্গে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তার ১৩ বছরের প্রতিভাবান কন্যা জিয়ানা যার মধ্যে ভবিষ্যতের তারকা হবার সমস্তরকম মালমশলা মজুত ছিল। কোবির অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণরত জিয়ানা অচিরেই তার বাবার স্বপ্নের দলে স্থানলাভ সুনিশ্চিত করে নেবেন এমনটাই অভিমত পোষণ করেন সুবিখ্যাত এনবিএ ধারাভাষ্যকার অ্যাডাম সিলভার। কোবির ক্যাবিনেটে শোভা পাচ্ছে পাঁচটি এনবিএ চ্যাম্পিয়নশিপ, ১৮টি এনবিএ



অলস্টার সিলেকশন ও ব্যাক টু ব্যাক অলিম্পিক স্বর্ণপদক এসব তথ্য দিয়ে কোবিকে মূল্যায়ন করলে তার প্রতি প্রকৃত সুবিচার করা হবে না। যে অপরিসীম উদ্দীপনা ও জীবনে জীবন যোগ করার গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞান তিনি তৈরি করে গেছেন যা বছরের পর বছর মার্কিন যুব সমাজকে জীবনের চেয়ে বড়ো কিছু করার প্রেরণা জোগাবে সেটাই সম্পূর্ণ কোবি ব্রায়ান্ট। মার্কিন ধনকুবেরা যে দলে দলে এনবিএ-তে বিনিয়োগ করেন তার মূলে কোবি ব্রায়ান্টের অতুলস্পর্শী জনপ্রিয়তা। দেশের বিপণন জগতে এক নম্বর সেলেবল কমোডিটি এনবিএ তারকারা। এই পথটা তৈরি করে দিয়েছেন কোবি ব্রায়ান্টরা। যে সাফল্য ও গৌববকে শুধু বাস্কেটবল কোর্টে সীমাবদ্ধ না রেখে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন গোটা মার্কিন দেশে বা বিশ্বসমাজে। এবারে একটু দেশে নেওয়া যাক অকাল প্রয়াত কোবি ব্রায়ান্টের এই মৃত্যুতে কারা শোকবার্তা পাঠিয়েছেন।

লেব্রন জেমস (বর্তমান সুপারস্টার) : আমি নিশ্চিত আপনি যে ঐতিহ্য ও পরম্পরা তৈরি করে গেছেন তা খেলাটির মহত্ব ও দেশের গরিমাকে বহু বছর সবচেয়ে উঁচুতে ধরে রাখবে। স্বর্গ থেকে আমাকে শক্তি দিন যাতে আমি যে পথ ও দৃষ্টান্ত আপনি গড়ে দিয়েছেন তা সযত্নে রক্ষা করতে পারি। আপনি নিজেই যেন এক প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠান শুধু বাস্কেটবলেরই নয় প্রকৃত মানুষ তৈরি করারও চালিকশক্তি।

লিয়নেল মেসি (বিশ্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলার) : আপনার সঙ্গে বহু বড়ো বড়ো শোবিজ ইভেন্টে একসঙ্গে সময় কাটিয়েছি যা আমার বাকি জীবনের পরম সম্পদ। আপনার প্রয়াণে গোটা বিশ্বের খেলার জগতই দীন-দরিদ্র হয়েছে।

রাফায়েল নাদাল : সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাথলিট। যে শুধু শরীরসর্বস্ব গেম খেলত না, খেলত হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়ে। তাই এক স্বয়ংসম্পূর্ণ অ্যাথলিট যার বোধবুদ্ধি ও শক্তি, গতি সব অর্থেই পরিপূর্ণ। তার খেলা দেখে এটাই মনে হয়েছে ভয়ংকর সুন্দর এক নান্দনিক রূপ কল্প। তার জীবনাচরণ থেকে অনেক কিছু শিখেছি।

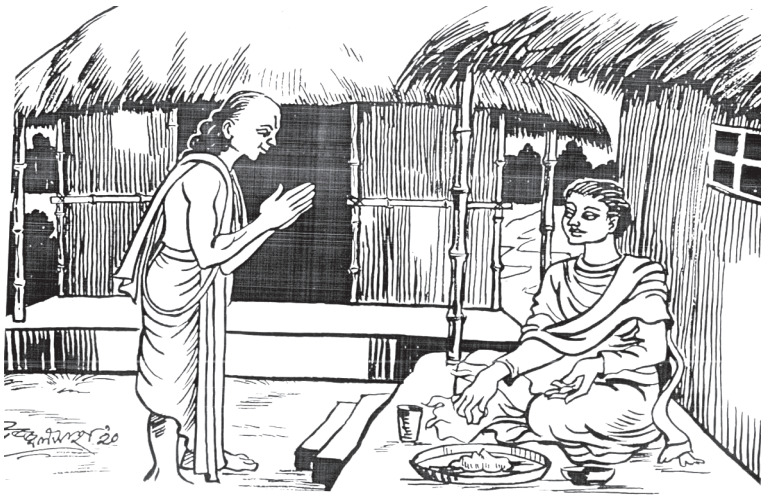
ডেঞ্জিল ওয়াশিংটন (হলিউড হিরো) : আমি যখন হলিউড সিনেমায় প্রথম পা রাখি তখন কোবি ব্রায়ান্ট গোটা মার্কিন যুব সমাজে আইকনিক রোল মডেল। এত বড়ো তারকা এক অর্থে জাতীয় নায়ক হয়ে কীভাবে মিডিয়াকে সামলেছেন, জন-সম্পর্ক বজায় রেখে গেছেন তা দেখে অনেক কিছু শিখেছি। আমেরিকায় ব্ল্যাক পাওয়ারকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। আজ বুঝি নিজে কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে যেভাবে শ্বেতশক্তিসর্বস্ব হলিউডে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি তার মূলে ওই এনবিএ-র ব্ল্যাক পাওয়ারের ম্যাজিক। এনবিএ সাদা-কালোর ভেদাভেদ অনেকাংশে ভুলিয়ে দিতে পেরেছে।

বারাক ওবামা (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি) : আমি যখন দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে পা রাখি হোয়াইট হাউসে তখন যে শুভেচ্ছাবার্তাটি পাঠিয়ে ছিলেন কোবি তা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

আমার থেকে কয়েক বছর ছোটো হলেও কোবির চিন্তা-দর্শন আমাকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আলোর রেখা দেখিয়েছে। ওর বাচ্চা মেয়েটির মৃত্যুতে বাবা হিসেবে গভীরভাবে মর্মাহত। আর কোবির মৃত্যুতে গোটা যুক্তরাষ্ট্রবাসীর কাছে চরম পীড়াদায়ক ঘটনা! ■

অতিথি সেবা

পুরাকালে কুরুক্ষেত্রের কাছে এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। স্ত্রী, ছেলে আর ছেলের বউ নিয়ে তাঁর ছোট্টো সংসার। ব্রাহ্মণ যেমন পণ্ডিত আর তেমনই ধার্মিক। তিনি কোনো দান গ্রহণ করতেন না। ধ্যান, জপ আর শাস্ত্র আলোচনা নিয়ে থাকতেন। তাতেই যা পেতেন তা দিয়েই খুব কষ্ট করে সংসার প্রতিপালন করতেন। পরিবারের সবাই



একসঙ্গে একবেলা আহার করতেন। তিনি কোনো সঞ্চয় করতেন না। এটাই তাঁর কাছে তপস্যা ছিল। ভগবানকে পাবার জন্য তাঁর এই কঠোর তপস্যা।

একবার কুরুক্ষেত্রে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দেশের শস্য শেষ হয়ে গেল। ফলে ব্রাহ্মণের কষ্টের দিন শুরু হলো। প্রায় প্রতিদিনই অনাহারে থাকতে হয়। ক্ষুধায় সকলকে কষ্ট পেতে হয়। হঠাৎ এমন হলো যে তিনদিন এককণা শস্যও সংগ্রহ করা গেল না। পরপর তিনদিন পরিবারের সবাই উপবাসী রইলেন। চারদিনের দিন ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে বহু চেষ্টার পর কিছু যব সংগ্রহ কর ঘরে ফিরলেন। যব থেকে ছাতু তৈরি হলো। এই ছাতু খেয়েই সেদিন সকলকে থাকতে হবে।

পরিবারের সবাই সেদিন নিয়মমতো জপ, আহ্নিক, যজ্ঞ প্রভৃতি শেষ করলেন। ভগবানকে নিবেদন করে সবাইকে সেই ছাতু ভাগ করে দেওয়া হলে। তাঁরা খেতে বসবেন এমন সময় এক অতিথি ক্ষুধায় কাতর হয়ে উপস্থিত হলো। '—গৃহস্থের মঙ্গল হোক। এ বেলাটা তোমাদের এখানেই কাটাতে হবে ঠাকুর। অনেকটা দূরের পথ যেতে হবে তো।'

ব্রাহ্মণ করজোড়ে বললেন, 'অতিথি নারায়ণ। আমার দ্বারে উপস্থিত। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব যদি সেবা করার সুযোগ পাই।' —'বেশ বেশ। তোমার ধর্মজ্ঞান দেখে বড়ো পরিতুষ্ট হলাম' বলতে বলতে অতিথি আসন গ্রহণ করল।

অতিথির সেবা করা পরম ধর্ম। ব্রাহ্মণ পরম যত্নে অতিথিকে গ্রহণ করলন। তাঁকে যথারীতি পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন দিয়ে বিনীত ভাবে বললেন, আমার ঘরে সামান্য ছাতু আছে। আমি এই ছাতু পবিত্রভাবে সংগ্রহ করেছি। আপনি দয় করে গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণ নিজের অংশ অতিথিকে দিলেন। কিন্তু এত কম ছাতুতে তাঁর ক্ষুধার নিবৃত্তি হলো না, তৃপ্তিও হলো না। ব্রাহ্মণ মনে মনে দুঃখিত হলেন। তাঁর স্ত্রী স্বামীর মনের ভাব বুঝতে পেরে তাঁকে বললেন, আমার ভাগেরটিও আপনি অতিথিকে দিন।

ক্রমাগত অনাহারে দুর্বল অস্থিচর্মসার শীর্ণা সহধর্মিণীর কথা শুনে ব্রাহ্মণের চোখে এল। তিনি বললেন, শাস্ত্রমতে স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার স্বামীর। শরীর রক্ষার জন্য তোমার আহারের প্রয়োজন। স্ত্রীকে যে দু'মুঠো খেতে দিতে পারে না, শত শত সৎকাজেও তার পুণ্য হয় না। কিন্তু স্ত্রী স্বামীর কথা শুনলেন না। নিজের ভাগের ছাতুটুকু অতিথিকে দিলেন। এতেও অতিথির তৃপ্তি হলো না।

এবার ব্রাহ্মণের ছেলে বলল— বাবা, বৃদ্ধ বয়সে আপনাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। যারা সৎপুত্র তারা সর্বদা পিতা-মাতার সেবা করে। তাঁরা যাতে খুশি থাকেন তার চেষ্টা করে। তাই আমার ভাগটিও আপনি অতিথিকে দিন। কিন্তু এতেও অতিথির পেট ভরল না। তখন পুত্রবধূ নিজের ভাগের ছাতু এনে দিয়ে বলল— বাবা, আপনি আমার গুরুর গুরু। আপানার যাতে মঙ্গল হয় তা আমার করা কর্তব্য। যদি আমাকে আপনার পুত্রবধূ মনে করেন তাহলে এই ছাতু অতিথিকে দিন। অতিথি তৃপ্তি লাভ করুন। ব্রাহ্মণ কেঁদে ফেললেন। বললেন— মা, তুমি নিতান্ত বালিকা। ক্ষুধার জ্বালা তুমি সহ্য করবে কেমন করে? তবু ধর্মকাজে তুমি আমাকে সাহায্য করছ। তোমার মঙ্গল হোক। এই বলে ব্রাহ্মণ পুত্রবধূর ভাগের ছাতুটুকুও অতিথির সামনে তুলে ধরলেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের অপূর্ব অতিথি সেবায় পরম পরিতুষ্ট হযে অতিথি বলল, 'আমি ধর্ম। তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছিলাম। এত কষ্টের মধ্যেও তুমি ধর্মকে আশ্রয় করে আছ। এর তুলনা নেই। ক্ষুধায় মানুষের জ্ঞান থাকে না, ধৈর্য থাকে না, ধর্মবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। এই ক্ষুধাকে যে জয় করতে পারে সে সাধু। আর যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করতে পারে, তার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। শ্রদ্ধা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। তুমি শ্রদ্ধার দান দ্বারা পুণ্যলাভ করেছ। ওই দেখ, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করছেন। তোমার জয় হোক।'

এই বলে ছদ্মবেশী ধর্ম অদৃশ্য হলেন।

শ্যামাপদ সরকার

ভারতের পথে পথে

কুলু



কুলুকে বলা হয় 'ভ্যালি অব গডস'। রামায়ণ-মহাভারতেও কুলন্তপীঠ অর্থাৎ বাসযোগ্য প্রান্তভূমি নামে উল্লেখ মেলে কুলুর। পাহাড়-পর্বতে ঘেরা, পাইন ও দেবদারুতে ছাওয়া ৭৬০ থেকে ৩৯১৫ মিটার উচ্চে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২ কিলোমিটার প্রস্থ কুলু উপত্যকা। এখান দিয়ে বয়ে চলেছে শতদ্রু, বিয়াস, সেহু, তীর্থন, পার্বতী, সরোবরী, চন্দ্র, ভাগা সব পাহাড়ি নদী। রক্তিম আভার সোনালি আপেল ফলে কুলুতে। বসন্তকালে কুলুকে থরে থরে সাজিয়ে তোলে খুবানি, আপেল, নাসপাতি আর চেরি। গ্রীষ্মকালে ভরে যায় রক্তিম আভার রডোডেনড্রন ফুল আর শরৎকাল সাজিয়ে তোলে চাষিভাইয়েরা ধান,যব ও গমের সোনালি আভায়। এখানকার প্রকৃতি রূপে রসে মনোমুগ্ধকর। পর্যটক আসেন দেশদেশান্তর থেকে। দশেরা উৎসব এখানে খুব জাঁকজমক ভাবে হয়। মানালি থেকে আসেন হিড়িম্বা দেবী রথে চড়ে। আসেন মালানা গ্রামের দেবতা জমলু। স্থানীয় এলাকা থেকে ছশোর বেশি দেবতা আসেন মেলায়। সারা বিশ্বে এই দশেরা মেলার প্রশস্তি রয়েছে।

জানো কি?

বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীক

- ভারত—অশোকচক্র।
- বাংলাদেশ—শাপলা।
- সিরিয়া—ঈগল।
- ব্রিটেন—গোলাপ
- ইতালি—শ্বেতপদ্ম।
- অস্ট্রেলিয়া—ক্যাঙ্গারু।
- ফ্রান্স—লিলি।
- ত্রিনিদাদ—হামিংবার্ড।
- জাপান—চন্দ্রমল্লিকা।
- নেদারল্যান্ড—সিংহ।

ভালো কথা

চিড়ের উপর মানচিত্র

ছোটো ছোটো জিনিসের উপর কোনো কিছু আঁকার কথা আমরা শুনেছি। মুসুরির ডালের উপর, চালের উপর, পোস্ত দানার উপর। এবার চিড়ের উপর ভারতের মানচিত্র এঁকে ফেলল আমাদের শান্তিপুরের শাওন পাল। সেজন্য তার সেই শিল্পকর্ম বুক অব গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নিয়েছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি শাওন কর্তৃপক্ষের থেকে শংসাপত্র পেয়েছে। চিড়ের উপর তার আঁকা ভারতের মানচিত্রের দৈর্ঘ্য মাত্র ১.৫ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ০.৫ সেন্টিমিটার। শাওনের এই কৃতিত্ব আমরা যারা ছবি আঁকি তাদের অনুপ্রাণিত করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সৃজন সরকার, দ্বাদশ শ্রেণী, শান্তিপুর, নদীয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

শিবঠাকুরের দেশে

অনির্বাণ সাহা, দ্বাদশ শ্রেণী, বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ

শিবঠাকুরের আপন দেশে
ঘুরছে শিব সারা দেশে
ষাঁড়ের পিঠে চেপে।
মা কালী খাঁড়া হাতে
পাঁঠা খাবে মনের সুখে
যুগযুগান্তর যুগে যুগে।

কৃষ্ণঠাকুর বাজাবে বাঁশী
মুখে তাঁর মোহন হাসি
যুগে যুগে আনবেন তিনি।
এসবের জন্য আছে দেশ
ভারতবাসী আছে বেশ
একথাটি সবাই মানি।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ২৫।।

পরবর্তী সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত রেখে তাঁকে দেওলীলা তথা নাসিকে রাখা হলো। ওই সময় শ্রীগুরুজী (মাধবরাও গোলওয়ালকর) তাঁর খুব সেবা করলেন।



চিকিৎসকরা ডাক্তারজীকে রাত দশটায় শুয়ে পড়তে বললেন। কিন্তু ডাক্তারজীর কথাবার্তায় এমন যাদু ছিল যে, চিকিৎসক নিজেই ভুলে যেতেন সে সময়।



১৯৩৯ সালের ১৬ আগস্ট নাগপুরে গুরুপূর্ণিমা উৎসবে শ্রীমাধবরাও গোলওয়ালকর (শ্রীগুরুজী) সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করলেন ডাক্তারজী।



আজ থেকে আপনি সঙ্ঘের সরকার্যবাহের দায়িত্ব পালন করবেন।



দিদির তোষণ

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূলনেত্রী

দিদি, বসন্ত এসে গেছে। কিন্তু এই বসন্তে আমি বিভ্রান্ত। আপনার শরণ নিয়েছি তাই। আচ্ছা দিদি আপনি এত ধর্মপ্রাণ কেন বলতে পারেন! সবাই জিজ্ঞেস করে তোমার দিদি এত ধর্ম ধর্ম করেন কেন? আমি না উত্তর দিতে পারি না। প্রথম প্রথম এই সব প্রশ্নের পাত্তা দিতাম না। এখন তো আমার নিজের মনেই এই নিয়ে হাজারো প্রশ্ন। সেই নির্বাচনী প্রচারের সময়ে দেখতাম আপনি মঞ্চে উঠেই তেত্রিশ কোটি দেবতার বন্দনা শুরু করে দেন। একের পর এক মন্ত্র। জানেন দিদি, আপনার মুখে শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে।

বাড়িতে কালীপুজো করেন। আর মঞ্চে উঠে যত দেব, দেবীর নাম জানেন সবার নামেই ফুল দেন মন্ত্রে মন্ত্রে। একজন বলছিল আসলে আপনি বিজেপি রাজ্যে শক্তিশালী হওয়ার পরে নিজেকে হিন্দু প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন বলেই লোকসভা নির্বাচনের আগে অত মন্ত্রপাঠ করেছেন। আমি সেসব কথা বিশ্বাস করিনি। কারণ, আমি মনে মনে বিশ্বাস করেছিলাম যে আপনি সত্যিই হিন্দু-ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু ভোটে খারাপ ফল করার পরে আপনি যা বলেছিলেন তাতে আমার সব বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছিল।

"হ্যাঁ, আমি তো মুসলিম তোষণ করি। যে গোরু দুধ দেয় তার লাথও খাব।" লোকসভা নির্বাচনের পরে এমনটাই বলেছিলেন আপনি তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন আবার আপনার নতুন সুর। এই তো সেদিন একেবারে ভিন্ন সুরে কথা বললেন। বললেন, আপনি আসলে মানবতার তোষণ করেন। কেউ কেউ বলে আপনি মুসলমান তোষণ করেন। এটা নাকি অভিযোগ।

সেদিন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দের জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান ছিল কলকাতায় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। সেখানে বক্তৃতা দিতে গিয়েই নিজের নীতি সম্পর্কে ওই মন্তব্য করেন আপনি। নিজের কানে শুনলাম আপনি বললেন, "কেউ কেউ বলে আমি মুসলমান তোষণ করি। কিন্তু আমি আসলে মানবতার তোষণ করি।"

সেদিনের বক্তব্যে আপনি সরাসরি বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ না করলেও আপনার কথার মধ্যে সেই ইঙ্গিত ছিল স্পষ্ট। আপনি বলেন, "আজকাল কেউ কেউ উদ্ভট ধর্মের কথা বলে। যাদের ভালো লাগবে ওদের তাদের রাখবে, আর যাদের ভালো লাগবে না তাদের বের করে দেবে। এসব কার কথা বললেন আমার মোটা মাথায় ঢোকেনি। পরে একজন পাশ থেকে বলে দিল আপনি নাকি বিজেপির কথাই বলছেন।

আপনি সেখানে টেনে নিয়ে আসেন শিকাগো সফর বাতিলের প্রসঙ্গও। বললেন, "আমাকে শিকাগো থেকে স্বামীজীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু পরে আমাকে জানানো হয় ওই অনুষ্ঠানটা বাতিল হয়েছে। আমি কিছু মনে করিনি। কারণ, আমি বুঝেছি ওদের উপরে চাপ তৈরি করা হয়েছিল।" এর পরে আপনি নিজের থেকেই তোষণ প্রসঙ্গে টেনে আনেন। জানিয়ে দেন, তিনি আদৌ মুসলমান তোষণ করেন না। তিনি মানবতার তোষণ করেন।

তবে সেদিন আপনার ওই বক্তব্যের পরেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। কয়েক মাস আগে আপনার লোকসভা নির্বাচনের পরের বক্তব্য নিয়ে কথা হতে থাকে। আমাকে তাদেরই একজন বুঝিয়ে বলল, সেই সময়ে রাজ্যে ভোটের ভাগে স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে, সংখ্যালঘু ভোট উজার করে পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্য দিকে তীব্র মেরুকরণে ১৮টি আসন পেয়ে যায় বিজেপি। এর পরে প্রথমে আপনি চুপ থাকলেও পরে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, 'বাঙ্গলার ভোটে এ বার টোটাল হিন্দু-মুসলমান হয়েছে'। তারপর পরই সাংবাদিকদের বলেন, "৩১ তারিখ আমাদের ইফতার আছে। আপনারা আসবেন। আমি যাব। হ্যাঁ আমি তো মুসলিম তোষণ করি। যে গোরু দুধ দেয় তার লাথও খাব।"

ওই বক্তব্য নিয়ে সেই সময়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। সরাসরি আক্রমণে নেমেছিল বিজেপি। আমি কিন্তু কোনও বিতর্কে অংশ নিইনি। বলেছিলাম দিদি, লাথ খাবেন তো খাবেন। আপনাদের বাবার কী?

এখন কী বলব দিদি?

—**সুন্দর মৌলিক**

পাশ্চাত্যের দেশগুলির শরণার্থী নীতি নিজেদের ইচ্ছাধীন, তাহলে ভারতে নাক গলানো কেন?

অতিথি কলম



স্বপন দাশগুপ্ত

গত সপ্তাহে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ানের বন্ধনমুক্ত ব্রিটেন তার নিজের মর্জিমতো অভিবাসন নীতি প্রকাশ করেছে। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়ে পয়েন্ট দেওয়ার রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সে দেশে থাকার যোগ্য বিবেচিত হতে গেলে নির্দিষ্ট দক্ষতাই প্রধান বিবেচ্য। ব্রিটেনে প্রচলিত ওয়েলফেয়ার স্কিমগুলির ক্ষেত্রে বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠবেন না, এমন ব্যক্তিদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সেদেশে বসবাসের অধিকার পাওয়ার জন্য অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যথেষ্ট ইংরেজিতে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক শর্ত। প্রত্যাশিত ভাবেই ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের ওপর এই বাড়তি গুরুত্ব আরোপকে অনেক মহল থেকে সংস্কৃতিগতভাবে একপেশে বলা হয়েছে। কিন্তু দেশের অভিবাসন নীতিতে এই পরিবর্তন এনেছে একটি গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকার। এই সরকারের নির্বাচনী ইস্তাহারেও উল্লেখিত পরিবর্তন যে আনা হবে তার উল্লেখ ছিল।

একটি সার্বভৌম জাতির নিজের দেশে অন্য কাকে তারা বসবাসের অধিকার দেবে না দেবে এমন বিষয় নিয়ে অতীতে কখনই কোনো বিতর্ক ওঠেনি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মাত্র গত সপ্তাহেই একটা গোটা উড়োজাহাজ ভর্তি ইথিয়োপিয়া থেকে আগত ইহুদিদের ইজরায়েল সাদরে নিজেদের দেশে বসবাসের জন্য গ্রহণ করেছে। ইজরায়েলের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ইহুদিদের সে দেশে ফিরিয়ে আনার নীতিগত অবস্থনেরই এটি অঙ্গ। এই 'রাইট অব রিটার্ন' (প্রত্যাবর্তনের অধিকার) ইজরায়েল দেশটি তৈরি হওয়ার একটি ভিত্তিমূলক অপরিবর্তনীয় তত্ত্ব। একই সূত্রে ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড, জার্মানির মতো দেশেও যে ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষদের সেদেশে বসবাসের উপযুক্ত প্রমাণ দিতে পারবে সেই দেশগুলিতে তার থাকার অবাধ অধিকার দিয়েছে।



উলটো দিকে, বিশ্বের বহু দেশেই সেখানে কারা থাকার অধিকার পাবে সে বিষয়ে নিজস্ব নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। হাঙ্গেরি এ বিষয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেওয়া নির্দেশ বারবার লঙ্ঘন করেছে। তারা স্পষ্ট জানিয়েছে ইরাক, সিরিয়া বা উত্তর আফ্রিকা থেকে আসা কোনো উদ্বাস্তুকে তারা দেশে আশ্রয় দেবে না। তারা নিজের দেশের ক্ষেত্রে 'এই উদ্বাস্তুরা গ্রহণের অযোগ্য' একথা বলতে দ্বিধা করেনি। পূর্ব ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশ যেমন— পোল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র বা স্লোভাকিয়াও এই উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেওয়ার বিষয়ে প্রকাশ্যে অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে।

অন্যদিকে, ২০১৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নানান নৃশংস অত্যাচার চালানোজনিত হঠাৎ জাগা অপরাধবোধ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এমনকী যাদের সঙ্গে জার্মানির কোনো সীমান্ত পর্যন্ত নেই, সেরকম ৮ লক্ষ শরণার্থীকে এলোপাথাড়ি ভাবে গ্রহণ করে নেয়। এরা বিশ্বের নানা প্রান্তে যুদ্ধের শিকার হওয়া জার্মানির সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, যদিও পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশ বাছাই করে গ্রহণের নীতি নেওয়ার উপদেশ দিয়েছিল। এই মন্ত্রণাদাতাদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করে। বিশ্বের তাবৎ দেশকেই কীভাবে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় পরিচালনা করতে হবে সে বিষয়ে জ্ঞান বিতরণকারী হিসেবে তার ট্র্যাক রিপোর্ট অবশ্যই ঈর্ষণীয়।

১৯৯০ সালে মার্কিন সেনেট সদস্য ফ্রাঙ্ক লুটেনবর্গের উদ্যোগে অ্যামেরিকায় ইহুদি ও বেশ কিছু খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের দ্রুত

অভিবাসন দিয়ে বসবাসের সুবিধে করে দিতে একটি সংশোধনী গৃহীত হয়। এই শরণার্থীরা মূলত পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক ছিল। এদের কাউকেই সেসময় মার্কিন নাগরিকত্ব পেতে ব্যক্তিগতভাবে যে তারা সোভিয়েত দেশে ধর্মীয় উৎপীড়নের শিকার হয়েছিল এমন কোনো ঘোষণা করা আবশ্যিক করা হয়নি। পরবর্তীকালে ২০০৪ সালে এই আইনের পরিধি বাড়িয়ে ইরান থেকে আগত 'বাহাই' সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপরও প্রয়োগ করা হয়।

সেনেটর লুটেনবার্গের তড়িঘড়ি এমন আইন পাশ করিয়ে এক শ্রেণীর মানুষকে বিশেষ সুবিধে দিয়ে অন্যদের বঞ্চিত করে নাগরিকত্ব প্রদানের মূলে ছিল জার্মানিতে হিটলারের ইহুদিদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচরের পৃষ্ঠপট। মনে রাখা দরকার, গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে জার্মানির মারণযজ্ঞের মূল লক্ষ্য ছিল ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষ। যারা পরবর্তী সময়ে গ্যাস চেম্বারে কাতারে কাতারে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের আমেরিকায় পালাবার কাগজ জোটাতে আর পাঁচটা লোকের মতোই পঙ্‌ক্তিতে অপেক্ষমান থাকতে হয়েছিল। জার্মানিতে সে সময় সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রজাতি এই ইহুদিদের পালিয়ে বাঁচারও কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। নাজি দলের কবলে থাকা ইউরোপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষার কোনো মূল্যই সেদিন কেউ দেয়নি। এই গল্পটই অন্য ভাবে লেখা হতো যদি সে সময় আমেরিকা পরবর্তীকালে ইরানে ও সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিপীড়িত মানুষদের নিজের দেশে আশ্রয় দিতে যেভাবে নিয়ম শিথিল করেছিল তার ছিটেফোঁটাও ইউরোপিয়ান ইহুদিদের ক্ষেত্রে যদি করত।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই United State Commission on International Religions Freedom (USCIRF) ভারতে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) লাগু হওয়া নিয়ে যে অবস্থান নিচ্ছে তা অসৎ বলা শ্রেয়। আগে বলা তার নিজের গৃহীত সিদ্ধান্তকে ন্যায়সঙ্গত মনে করলে ভারতের প্রতিবেশী তিনটি দেশের ধর্মীয় কারণে বিতাড়িত বা প্রাণ ও ধর্মরক্ষা করতে পলায়নকারী সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব প্রদান করতে আইন শিথিল করার কোনো সমালোচনা তাদের শোভা পায় না, বিশেষ করে তারা যখন দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বসবাস করছে। শুধু তাই নয়, আমেরিকা কখনই বুক ঠুকে বলতে পারবে না যে ভারতে আশ্রিত শরণার্থীদের ওপর কোনো ধর্মীয় নিপীড়ন হয়নি যা রক্ষা করতেই তারা নিজবাসভূমি ছেড়ে এসেছে। বলা দরকার, পাকিস্তানে খ্রিস্ট ধর্মবিশ্বাসীদের ওপর ধর্মীয় নিপীড়ন চালিয়ে তাদের ওপর আল্লার বিরুদ্ধে কুকথা বলার দায় চাপানো হয়। এ নিয়ে গোটা ইউরোপে সাড়া পড়ে যায়। কালবিলম্ব না করে এই নির্দিষ্ট ধারায় অভিযুক্তদের তুলে এনে ইউরোপ, কানাডা, ও আমেরিকার বহু রাজ্যে বসবাসের আইনি অধিকার দেওয়া হয়। এই ইতিহাস মাথায় না রেখে ভারতে নাগরিকত্ব আইন নির্দিষ্ট মানবিক উদ্দেশ্য নিয়ে সংসদে অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক কর্মীদের দৃষ্টিকোণ ও সিএএ বিরোধিতায় তাদের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করা পছন্দ করছে। তাদের (রাজনৈতিক কর্মী) প্রধানত মনগড়া যে আশঙ্কা ও ব্যক্তি-ধারণা অর্থাৎ এই আইন মূলত মুসলমানদের ভারতীয় নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছে এই মনোভাবকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে। এই ধরনের আশঙ্কা ছড়ানো যে আদ্যন্ত কাল্পনিক তা আমেরিকা ভেবে দেখছে না। যাই হোক, মার্কিনি ইউএসসিআইআরএফ-এর অবস্থান নাগরিকত্ব আইন নিয়ে যে বিক্ষোভ চলছে তার প্রধান চারটি বিন্দুর ওপর পেছন থেকে পর্যাপ্ত মদত দেওয়ারই কাজ করছে। এগুলি পর্যায়ক্রমে—(১) এমনটা চূড়ান্ত ভাবে ধরে নেওয়া যে অভিযুক্ত তিনটি ইসলামি দেশে বাস্তবে কোনো ধর্মীয় নিপীড়নই হয়নি। (২) বাংলাদেশ থেকে আসা উৎপীড়িত হিন্দু উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কাজের বা অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে ঢোকা সেখানকার সংখ্যাগুরু মুসলমানদের এক পঙ্‌ক্তিতে বসানো হোক। কোনো বিশেষ সুবিধে দেওয়া চলবে না। (৩) মায়নামার থেকে আসা রোহিঙ্গা মুসলমানদের সকলকে নাগরিকত্ব প্রদান করা ও এদেশে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেওয়া সর্বশেষ ভারতের উচিত তার ইসলমিক প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আধা-উন্মুক্ত বা পূর্ণ উন্মুক্ত সীমান্ত করে দেওয়া যাতে ওই দেশগুলি থেকে ইচ্ছুক যে কেউ নির্বিবাদে ভারতে ঢুকতে পারে। এগুলি নিঃসন্দেহে যারপরনাই বিতর্কিত রাজনৈতিক দাবি যা ভারতের জাতীয়তা ও সার্বভৌমত্বের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার ক্ষমতাধারী। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

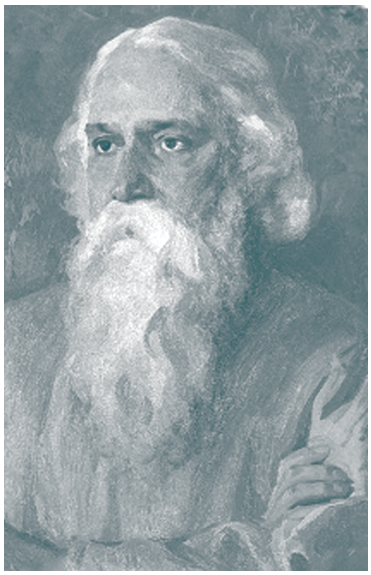
Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

বাংলা ভাষার সঙ্গে বিশ্বের পরিচয়ের প্রথম রূপকার রবীন্দ্রনাথ

ডাঃ বলরাম পাল

'আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস' এই শব্দবন্ধটির সঙ্গে এখন আমরা অল্পবিস্তর সবাই পরিচিত। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আরও দুটো কথা এসে যায়। তা হলো, বাংলাভাষা দিবস এবং মাতৃভাষা দিবস। আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের সঙ্গে বাংলা কীভাবে জড়িয়ে গেল সেটাই আলোচ্য বিষয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দু এবং ইংরেজি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। সে সময় গণপরিষদে পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। পাকিস্তান গণপরিষদে তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে পূর্ববঙ্গে শুরু হয় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ। এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন ধীরে ধীরে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলন এমন পর্যায়ে চলে যায় তাকে দমন করতে প্রশাসন লাঠি, গুলি এবং বল প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়, ফলত বহু বাঙ্গালির রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায় ভাষা আন্দোলন। অবশেষে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আনে এবং প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়।

১৯৫৪ সালে পাকিস্তন সরকার বাংলাকে একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে এবং ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের গণপরিষদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। তবে ১৯৫৩ সাল থেকেই ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি উদ্‌যাপন করা শুরু হয় মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। মাতৃভাষা আন্দোলনের কথা উঠলে, বাংলাভাষা আন্দোলনের কথা উঠলে, আরও দুটো আন্দোলনের কথা মনে পড়ে তা হলো মানভূম ভাষা আন্দোলন এবং শিলচর ভাষা আন্দোলন। যদিও মানভূমে বাংলা ভাষা আন্দোলন ১৯১২ সালে শুরু হয়। তবে এর প্রেক্ষিত ছিল আলাদা। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র মানভূম ও ধলভূম জেলাকে নতুন ভাবে গঠিত বিহার ও ওড়িশা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখন থেকেই ওই অঞ্চলের বাংলাভাষীদের মধ্যে এক বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে।



স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ভাষা আন্দোলন তীব্র ভাবে ছড়িয়ে পড়ে মানভূমের বাঙ্গালিদের মধ্যে। ১৯৫৬ সালের আগে পুরুলিয়া জেলা বিহারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময় রাজনৈতিক ভাবে পুরুলিয়ার স্কুল-কলেজ-সরকারি দপ্তরে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে, বাংলাভাষী জনগণ জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে, এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াই আন্দোলন সুদৃঢ় করেন। এরপর ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার মানভূম জেলার বাংলা ভাষাভাষী এলাকাকে ভেঙে নতুন পুরুলিয়া জেলা তৈরি করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত করতে বাধ্য হয়। আবার অসমের বরাক উপত্যকার বাংলাভাষা আন্দোলন ছিল অসম সরকারের অসমীয় ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র সরকারি ভাষা করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, যেহেতু ওই অঞ্চলের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল বাংলাভাষী। তাই অসমীয় ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে ১৯৬১ সালের ১৯ মে। সেদিন অসম প্রাদেশিক পুলিশ ১১ জন প্রতিবাদীকে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে গুলি করে হত্যা করে। এই ঘটনার পর অসম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। এখানে একটা কথা উল্লেখ করতেই হয়, ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতো সম্মান, বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে যেমন ভাবে জায়গা করে দিয়েছিল, ঠিক তেমনই পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন, বাংলাভাষা তথা মাতৃভাষা আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরেছিল। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৯৯ সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেয় এবং ২০১০ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হবে।

এখানে আরও একটি কথা উল্লেখ করতে হয়, ভাষা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র বাংলাভাষাকে নিয়ে হয়েছে তা কিন্তু নয়। দেশে দেশে যেমন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিয়ে অশান্তি, ঠিক তেমনই ভাষা নিয়ে দ্বন্দ্বও কম কিছু হয়নি। তাই ইউনেস্কো প্রত্যেকের মাতৃভাষাকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছে, ঠিক তেমনই সারা বিশ্বে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে 'এসপেরান্তো' ভাষাকে আন্তর্জাতিক দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা কিনা কোনো দেশের ভাষা নয়, কোনো জাতির ভাষা নয়, কারও মাতৃভাষাও নয়। এ ভাষায় আগে ব্যাকরণ তৈরি হয়েছে। পরে তৈরি হয়েছে ভাষা, তাই এ ভাষা শেখা অনেক সহজ হয়েছে। এসপেরান্তো ভাষাকে তাই বিজ্ঞানভিত্তিক ভাষাও বলা হয়। এখন সময় এসেছে এসপেরান্তো ভাষার প্রচার প্রসারে বিশ্বের সমস্ত দেশের অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া।

(আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

শোক সংবাদ

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি খণ্ডের পূর্বতন কার্যবাহ সুভাষ সরকারের সহধর্মিণী শ্রীমতী কৃষ্ণা সরকার গত ১৭ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ১ পুত্র, ২ কন্যা রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক দের কাছে তিনি 'কৃষ্ণা বউদি' নামেই পরিচিত ছিলেন। গত ৮-১০ মাস তিনি কিডনির রোগে ভুগছিলেন। তাঁর পুত্র সুজয় বর্তমানে ময়নাগুড়ি খণ্ডের হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সম্পাদক।



বালুরঘাটে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের জনসচেতনতা কার্যক্রম

মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' কার্যক্রম এবং লোকসভায় সদ্য পাশ হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্যোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে গত ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি এক প্রচারমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে নাগরিকত্ব সংশাধনী আইনের বিষয় বক্তব্য রাখেন বালুরঘাটের সাংসদ ড. সুকান্ত মজুমদার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত।

ড. মজুমদার তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কারভাবে জানান যে, ভারত সরকার নাগরিকত্ব আইনে যে সংশোধন এনেছে তার দ্বারা প্রকৃত ভারতীয়রা কোনোভাবেই সমস্যার সম্মুখীন হবেন না। এই আইন শুধুমাত্র প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত অত্যাচারিত সংখ্যালঘু শরণার্থীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি বলেন, যাঁরা এই আইনের বিরোধিতা করছেন তাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। শ্রীসেনগুপ্ত তাঁর ভাষণে বলেন, এটি একটি মানবিক আইন। তিনি দেশভাগের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, গান্ধীজী-সহ তৎকালীন ভারতের দেশনেতারা পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদানের বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেছিলেন, এই সরকার তা বাস্তবায়ন করেছে। ওই তিন দেশ থেকে আগত সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দেওয়া ভারত সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

বালুরঘাট শহরের নাট্যমন্দিরে দুদিনের এই অনুষ্ঠানে সিএএ বিষয়ক এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে নাগরিকত্ব সংশাধনী আইন বিষয়ে ভুল তথ্য ও সঠিক তথ্যকে পাশাপাশি তুলে ধরে সচেতনতা তৈরির চেষ্টা করা হয়। কার্যক্রমে দুদিন ধরে যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়।

দুদিনের এই অনুষ্ঠান ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার বিরাজ নারায়ণ রায়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

দুর্লভ শিল্পকর্ম প্রদর্শনী

বিড়লা কারিগরি এবং প্রযুক্তি সংগ্রহশালা (বিআইটিএস)-য় গত ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এক দুর্লভ শিল্পকর্মের প্রদর্শনী। ১৯৩২ সালের এপ্রিলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতা 'আমি যখন বাবার মতো হবো' এবং 'তবু মনে রেখো' গানটি জর্জ ন্যুম্যান জিএমবিএইচ ডিস্কে রেকর্ডিং যন্ত্রে রেকর্ড করেছিলেন। সেই গানের রেকর্ডিং ও যন্ত্রটি স্থান পেয়েছে এই প্রদর্শনীতে। এছাড়াও ১৬ এমএম মুভি প্রজেক্টর, টেলিফোন ম্যাগনেটো, রোটারি ডুপ্লিকেটিং মেশিন, মেকানিকাল ক্যালকুলেটর, ওয়াল টাইপ টেলিফোন উইথ রিসিভার, বেল'স ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক টেলিফোনের মতো ১৫টি দুর্লভ শিল্পকর্ম রয়েছে প্রদর্শনীতে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সচিব ও কিউরেটর ড. জয়ন্ত সেনগুপ্ত, প্রসার ভারতীর প্রাক্তন সিইও জহর সরকার, বিআইটিএম অধিকর্তা ভি এস রামচন্দ্রন, কলকাতায় রাশিয়ার উপ-বাণিজ্যদূত মি. ভি ডেমেনেতিয়েভ যৌথভাবে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. সেনগুপ্ত বলেন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং মানব সভ্যতার মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করতে এই ধরনের দুর্লভ শিল্পকর্ম সংগ্রহ করে রাখা প্রয়োজন। প্রসার ভারতীর সিইও শ্রীসরকার দুর্লভ শিল্পকর্মগুলি কীভাবে ব্যবহার করা হতো তা ভিডিয়ো ডিসপ্লের মাধ্যমে তুলে ধরার আহ্বান জানান। শ্রীরামচন্দ্রন বলেন, আগামীদিনে এই ধরনের দুর্লভ শিল্পকর্ম স্থায়ীভাবে বিআইটিএম-এ প্রদর্শিত করা যায় কী না তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। প্রদর্শনী ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলবে। সকাল সাড়ে দশটা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সকলের প্রবেশাধিকার থাকবে।

শ্রী বড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের বিবেকানন্দ সেবা সম্মান



কলকাতার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সামাজিক সংস্থা শ্রী বড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি জোড়াসাঁকো রথীন্দ্র মঞ্চে ৩৪তম বিবেকানন্দ সেবা সম্মান সমারোহের আয়োজন করা হয়। সেবা সম্মান প্রদান করা হয় ওড়িশার ধর্মনিষ্ঠ সেবাব্রতী, সম্বলপুরের ঋষিকুল সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ধর্মনিষ্ঠ জনপ্রিয় সেবাব্রতী স্বামী জীবন্মুক্তানন্দ পুরী মহারাজকে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ-এর চেয়ারম্যান ড. সুজিত ঘোষ। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় পশুপালন, ডেয়ারি ও মৎস্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রতাপ চন্দ্র সারঙ্গী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক লক্ষ্মীনারায়ণ ভালা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভুবনেশ্বরের প্রকাশচন্দ্র বেতালা , মনসুক সেঠিয়া ও বিশিষ্ট আয়কর পরামর্শদাতা সজ্জন তুলসীয়ান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পুস্তকালয়ের শতবর্ষ বিষয়ক গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্র।

যোগেশরাজ উপাধ্যায়ের বৈদিক মন্ত্রোচ্চরণের মাধ্যমে পূজ্য স্বামীজীকে মাল্যার্পণে ভূষিত করেন ভঁওরলাল মুন্ধ্রা। অধ্যাপক সুজিত ঘোষ শাল পরিয়ে এবং মন্ত্রীমহোদয় শ্রীসারেঙ্গী মানপত্র ও ১ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করে তাঁকে সেবা সম্মানে ভূষিত করেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে স্বামী জীবন্মুক্তনন্দজী বলেন, এই সম্মান ওড়িশার বনবাসী এলাকায় সেবাকাজের সম্মান। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর গুরু প্রয়াত স্বামী প্রেমানন্দজী এবং স্বামী লক্ষ্মণানন্দজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সম্মান প্রদানের প্রাপ্ত অর্থ তিনি জনসেবা হেতু 'সমর্পণ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট'-কে প্রদান করার ঘোষণা করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীসারেঙ্গী বলেন, 'ত্যাগ আর সেবাই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ভারতের এই আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যকে এখন সারা পৃথিবী স্বীকার করতে শুরু করেছে, কেননা আমাদের এই আধ্যাত্মিকতাই আমাদের সেবাভাবে উদ্বুদ্ধ করে। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সেবাভাবের মূর্ত প্রতীক। তাঁর পদচিহ্ন ধরে চলা সেবার জন্য সমর্পিত প্রাণ স্বামী জীবন্মুক্তানন্দজীর বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে ভূষিত হওয়া খুবই গর্বের বিষয়।'

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ড. তারা দুগড় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বংশীধর শর্মা। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

শান্তিপুরে শিক্ষক সঙ্ঘের উদ্যোগে নাগরিকত্ব আইনের সমর্থনে নাগরিক সম্মেলন

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলার শান্তিপুরে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ অনুমোদিত বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘ, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ এবং জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের উদ্যোগে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থনে প্রবুদ্ধ নাগরিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের রাজ্য কমিটির সম্পাদক নিশীথ বিশ্বাস।

জাঙ্গীপাড়ায় মুখ্যশিক্ষকের উপনয়নে সমাজ ভাবনার প্রকাশ

স্বয়ংসেবকদের ভাবনা সবসময়ই সমাজকেন্দ্রিক। সেজন্য তাদের পারিবারিক উৎসবও পরিণত হয় সামাজিক উৎসবে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ রাজা চক্রবর্তীর পুত্র তথা জাঙ্গীপাড়া খণ্ডের মথুরাপুর শাখার সহ মুখ্যশিক্ষক দিগন্ত চক্রবর্তীর শুভ উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সেই উপলক্ষ্যে ৭ ফেব্রুয়ারি ছিল প্রীতিভোজ। সেদিন ৬২০ জন নিমন্ত্রিত অভ্যাগতকে আপ্যায়নের পাশাপাশি চলল রক্তদান শিবির। পুরুষ-মহিলা-সহ ২১জন রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে হিমসাগর আমের চারাগাছ। রক্তদাতাদের হাতে প্রথম গাছটি তুলে দেন সঙ্ঘের সহ ক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল। এখানেই শেষ নয়, আপ্যায়নের মেনুকার্ডে রাখা হয় মরণোত্তর চক্ষু দানের আবেদন।





রাজা চক্রবর্তী বলেন, একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে আমরা এতজন মানুষকে একত্রিত করতে পেরেছি। তাঁদের যে রক্ত সংগৃহীত হলো তা কিছু মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাবে। তাঁদের আশীর্বাদও আমার ছেলে পাবে। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে ৪০টি গাছ বিতরণ করা হলো তা বড়ো হয়ে আগামীদিনে বায়ুদূষণ থেকে পরিবেশকে রক্ষা করবে। একই সঙ্গে আমার ছেলেও শিখে যাবে যে, পরিবারের পাশাপাশি তারও কিছু সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। দিগন্ত'র মা টুম্পাদেবী বলেন, পারিবারিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে কিছু সামাজিক কাজ করতে পেরে আমাদেরও ভালো লাগছে। আমাদের ছেলের ছোটো থেকেই চোখের সমস্যা ছিল। চোখ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছি। তাই মেনুকার্ডে আবেদনের সঙ্গে আমরা তিনজনেই চক্ষু দানের অঙ্গীকার করেছি। মৃত্যুর পর একটি চোখও যেন পুড়ে নষ্ট না হয় এটাই আমাদের আবেদন।

দিগন্ত দ্বারহাট্টা ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে জাঙ্গীপাড়া ডিএন উচ্চ বিদ্যালয়ের দশমশ্রেণীর ছাত্র। দিগন্ত'র কথায়, আমাদের তিনজনের চোখ ছ'জন মানুষের দৃষ্টিশক্তি ফেরাতে সাহায্য করবে। এর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘের রীতি মেনে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সেবার জন্য রাজা চক্রবর্তীর মা-বাবা মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন সহজেলা কার্যবাহ শ্যামল মালিক ও বিভাগ প্রচারক আশিস মণ্ডলের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে ডাঃ দীপঙ্কর মজুমদার এরকম পারিবারিক অনুষ্ঠানকে সামাজিক উৎসবের রূপ দেওয়ার জন্য চক্রবর্তী পরিবারকে সাধুবাদ জানান। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক অভিজিৎ ভাণ্ডারী জানান এরকম একটি অনুষ্ঠানে এসে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন।

ফিল্ড একজিবিশন অফিসের উদ্যোগে সরবেড়িয়ায় স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বচ্ছতা প্রদর্শনী

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের রিজিওনাল আউটরিচ ব্যুরোর ফিল্ড একজিবিশন কার্যালয়ের উদ্যোগে গত ৬ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনার সরবেড়িয়ায় স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বচ্ছতা বিষয়ক এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বসিরহাটের সাংসদ শ্রীমতী নুসরত জাহান রুহি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ খান। পিছিয়ে পড়া এই অঞ্চলটিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আধিক্য রয়েছে। তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখার ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

এলাকার প্রায় দু'হাজার মানুষ প্রদর্শনী ঘুরে দেখেছেন। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই প্রদর্শনীর ফলে সরবেড়িয়া অঞ্চলের মানুষ স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছতা সম্পর্কে সচেতন হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

একটি আবেদন

টিকিট কেটে রেলে চড়ুন
সসম্মানে ও সগর্বে যাত্রা করুন

বর্ষব্যাপী যাত্রী এবং মালপত্র বহনের জন্য যথাযথ মূল্যের টিকিট ক্রয়ের বিষয়ে যাত্রী সাধারণের মধ্যে সচেতনতা প্রচার কর্মসূচি চালানো সত্ত্বেও, কিছু যাত্রী এখনও একেবারেই টিকিট না কেটে /যথাযথ টিকিট না নিয়ে / মালপত্রের বুকিং না করে রেলভ্রমণ করছেন। এই ধরনের রেলযাত্রা বন্ধ করতে পূর্ব রেলওয়ে সর্বদা তার আওতাধীন বিভিন্ন শাখায় কঠোর টিকিট পরীক্ষা অভিযান (ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরীক্ষা, ফোর্ট্রেস পরীক্ষা এবং স্পেশাল ট্রেন নিয়ে অভিযান সমেত) চালু রেখেছে।

সকল ভ্রমণরত যাত্রীদের রেলওয়ে আইনানুসারে যথাযথ টিকিট কিনে এবং মালপত্র বুকিং করে সসম্মানে মাথা উঁচু করে রেলভ্রমণ করার আবেদন করা হচ্ছে। এর ফলে যাত্রী সাধারণের জন্য সুবিধাগুলির উন্নয়নও সম্ভবপর হবে। এই সুবিধা রেলওয়ের সম্মানীয় যাত্রীরাই উপভোগ করতে পারবেন।

যথাযথ টিকিট না নিয়ে রেলযাত্রা শাস্তিযোগ্য অপরাধ

প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে